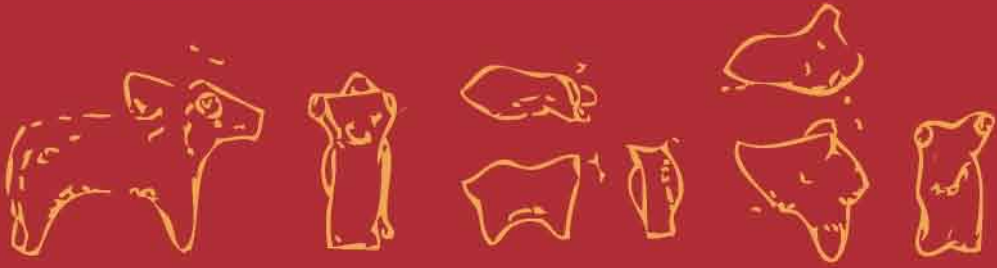


# সামাজিক বিজ্ঞান

## ষষ্ঠ শ্রেণী



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড  
ঢাকা



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ  
থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

---

# সামাজিক বিজ্ঞান

ষষ্ঠ শ্রেণী

## রচনা

মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী  
মুহম্মদ আনসার আলী  
লুৎফর রহমান  
নাজনীন বেগম  
ড. খন্দকার নিজামউদ্দিন

## সম্পাদনা

আব্দুস শহীদ  
মোঃ শামসুল হক  
আবুল হাসান  
জাহান-ই-গুলশান

---

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড  
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা  
কর্তৃক প্রকাশিত

[ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত ]

প্রথম মুদ্রণ : জানুয়ারি, ১৯৯৬  
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০  
পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৮  
পুনর্মুদ্রণ :

প্রচ্ছদ  
সেলিম আহমেদ

কম্পিউটার কম্পোজ  
ফাইন ডট লি:

চিত্রাঙ্কন  
মনিরুজ্জামান শিপু  
মাতিয়া বানু শুকু

মানচিত্রাঙ্কন  
দি ম্যাপ্পা  
গ্রাফোসম্যান

ডিজাইন  
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

---

মুদ্রণে :

## প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য “শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স” গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালের নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষা বিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচ্ছদ প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশা করা যায়, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায় শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যে-কোনো বিষয়কে বিচার-বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়টি সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, অর্থনীতি ও জনসংখ্যা শিক্ষার বিষয়বস্তু সমন্বয়ে এবং নতুন নামকরণ ও আজিকে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং শিখনফলের সঙ্গে সংগতি রেখে বিষয়বস্তু চয়ন করা হয়েছে। বিষয়টির পঠন-পাঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যাতে দেশ, জাতি, রাষ্ট্র ও সমাজের বিবর্তন ও অগ্রগতির ধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখা হয়েছে। আশা করা যায়, এটি পাঠে তরুণ শিক্ষার্থীরা দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হবে, সুনামগরিকের গুণাবলি অর্জন করবে এবং তাদের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে। তদুপরি পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু অধ্যয়নের মাধ্যমে এ বিষয়ে তাদের উচ্চতর জ্ঞানলাভের ভিত্তিও রচিত হবে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টার সজ্জী হিসেবে শিক্ষার্থীদের সৃষ্টি বিকাশে বর্তমান সংস্করণে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও চেতনা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

## সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	মানুষ ও সমাজ	১
দ্বিতীয় অধ্যায়		
প্রথম পরিচ্ছেদ	মানবসমাজের বিবর্তন	৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিচিতি	১১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	সভ্যতার উত্তরণ	১৩
তৃতীয় অধ্যায়	প্রাচীন যুগে ভারতীয় উপমহাদেশ	১৯
প্রথম পরিচ্ছেদ	সিন্ধু সভ্যতা	
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	আর্যদের আগমন ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব	২২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	মৌর্য সাম্রাজ্য	২৫
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	গুপ্ত সাম্রাজ্য	২৮
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	গুপ্ত-পরবর্তী যুগ	৩১
চতুর্থ অধ্যায়	প্রাচীন যুগে বাংলাদেশ	৩৫
প্রথম পরিচ্ছেদ	আদি মানব-সংস্কৃতি-প্রাচীন জনপদ-আর্যদের আগমন	
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	বাংলায় মৌর্য ও গুপ্ত শাসন	৪০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	গৌড়রাজ শশাঙ্ক ও শশাঙ্ক-পরবর্তী যুগ	৪১
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	বাংলায় পাল শাসন : গোপাল-ধর্মপাল-দেবপাল-প্রথম মহীপাল ও রামপাল	৪৩
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার দেব ও চন্দ্র বংশ	৪৬
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	বাংলায় সেন শাসন-মুসলমানদের আগমন	৪৯
সপ্তম পরিচ্ছেদ	প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড	৫২
পঞ্চম অধ্যায়	পৌরনীতির পরিচয় ও বিষয়বস্তু	৫৪
ষষ্ঠ অধ্যায়	নির্বাচন	৫৮
সপ্তম অধ্যায়	মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা	৬০
অষ্টম অধ্যায়	অর্থনীতির দুইটি মৌল বিষয় : অভাব ও উপযোগ	৬৪
নবম অধ্যায়	মহাদেশ	৭০
দশম অধ্যায়	এশিয়া মহাদেশ	৭৪
একাদশ অধ্যায়	দক্ষিণ এশিয়া	৮৪
দ্বাদশ অধ্যায়	বাংলাদেশ	৯০
ত্রয়োদশ অধ্যায়	পৃথিবী ও বাংলাদেশের জনসংখ্যা	৯৯
চতুর্দশ অধ্যায়	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ	১০৪

## প্রথম অধ্যায়

# মানুষ ও সমাজ

### মানব সমাজ

পৃথিবীতে নানা রকম প্রাণী বাস করে। মানুষও হাজার হাজার বছর ধরে এ পৃথিবীতে বাস করছে। কিন্তু তারা কেউ একা বাস করতে পারে না। সবাই মিলে একসঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। অনেক মানুষ একসঙ্গে মিলেমিশে বাস করার ফলে তাদের মাঝে বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা ও দয়ামায়ার সৃষ্টি হয়। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে একে অপরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে। এভাবে সবার সঙ্গে সবার ভাবের আদান-প্রদান হতে থাকে ও এদের মাঝে একটি মানসিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারা পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল হয়। এভাবে মিলেমিশে থাকা একতাবদ্ধ মানবগোষ্ঠীকে বলা হয় মানব সমাজ।

একটি মানব সমাজের ভেতর পরিবার, গোত্র, ক্লাব ও সমিতি ইত্যাদি আরও অনেক ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান ও সংঘ থাকে। শুধু মানুষ নয়, পশুপাখি এবং কীটপতঙ্গের মাঝেও দলবদ্ধ জীবনধারা দেখা যায়। অর্থাৎ কোনো কোনো জীবজন্তুও সামাজিক জীবনযাপন করে। যেমন, উইপোকারা ঢিবি তৈরি করে বা মৌমাছির মৌচাক গড়ে তার মাঝে সবাই মিলে থাকে। হাতির দল বেঁধে একসঙ্গে চলাফেরা করতে ভালোবাসে। আবার কোনো কাক বিপদে পড়লে সব কাক দল বেঁধে তাকে বাঁচাতে চলে আসে।

মানুষ একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। সে পরিবার কোনো একটি গোত্র বা সম্প্রদায়ের মাঝে থাকে। প্রাচীনকালের সমাজ গঠনের আগে পরিবার-প্রথা ছিল না। মানুষ বনজঙ্গলে হিংস্র প্রাণীর সঙ্গে একাকী বাস করত। খাদ্যদ্রব্য ও আশ্রয়ের খোঁজে তাদেরকে একাই এসব প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সবসময় লড়াই করে বাঁচতে হত। জীবন ছিল ভয়ানক কষ্টের ও বিপজ্জনক। এরকম দুঃখকষ্ট ও বিপদ-আপদের মাঝে একা একা বাস করা সম্ভব ছিল না। খাবার যোগাড় করতে ও হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখতে মানুষ দলবদ্ধ হয়ে বাস করার প্রয়োজন অনুভব করে। অর্থাৎ আত্মরক্ষার তাগিদেই আদিম মানুষ প্রথম দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে শুরু করে। এভাবেই মানুষ সর্বপ্রথম সমাজ গঠন করে।

তা ছাড়া জীবন বাঁচানোর জন্য মানুষের আরও কিছু মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে হয়। যেমন, খাবার, পোশাক, বাসস্থান, চিকিৎসা, নিরাপত্তা, শিক্ষা, অবসর বিনোদন ইত্যাদি। এসব মৌলিক প্রয়োজনও মানুষ একা মেটাতে পারে না। খাদ্যশস্যের জন্য মানুষকে কৃষকের কাছে, কাপড়ের জন্য তাঁতীর কাছে, বাসগৃহের জন্য মিস্ত্রির কাছে, চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে ও শিক্ষার জন্য শিক্ষকের কাছে যেতে হয়। সমাজের একজন মানুষ অন্যজনের এসব প্রয়োজন মেটাতে এগিয়ে আসে। তাই মানুষ একত্রে মিলেমিশে সমাজ গঠন করে।

### মানুষ ও সমাজের সম্পর্ক

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। মানুষকে নিয়েই সমাজের সৃষ্টি। মানুষ ছাড়া সমাজ কল্পনা করা যায় না। আবার সমাজ ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। মানুষের জীবনের সব দরকারি চাহিদা সমাজ মেটায়। মানুষের জীবন সুন্দরভাবে চলার জন্য কিছু নিয়মকানুনের প্রয়োজন। সমাজ এসব আইনকানুন ও বিধিনিষেধ তৈরি করেছে। সমাজের মানুষকে এসব বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। তাই সমাজে বাস করতে হলে মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ, সহানুভূতিশীল, পরোপকারী ও নিঃস্বার্থ হতে হয়। সমাজের কল্যাণের জন্যই মানুষকে এসব মানতে হয়। আবার মানুষের কল্যাণের জন্যই সমাজের সৃষ্টি। সমাজ জীবন ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সমাজ ও মানুষ একে অন্যের পরিপূরক।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের চিন্তাভাবনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষারও পরিবর্তন ঘটে। এসব পরিবর্তনের সঙ্গে মিল

রেখে মানুষ নতুন করে সমাজের আইনকানুন তৈরি করে। যে সমাজ যত বেশি চাহিদামতো আইন ও বিধিনিষেধ তৈরি করতে পারে, সে সমাজ তত বেশি স্থায়ী হয়। যে সমাজ মানুষের দরকারমতো চাহিদা মেটাতে পারে না, সে সমাজ ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সহজেই ভেঙে পড়ে। পৃথিবীতে এরকম বহু সমাজ সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

মানব সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল। বহু শতাব্দী ধরে মানব সমাজের পরিবর্তন ঘটছে। কেউ কেউ পরিবারকেই সবচেয়ে পুরোনো ও ক্ষুদ্রতম সমাজ বলে ধারণা করেন। এ পরিবার বা সমাজ বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন পরিবেশে প্রয়োজনমতো বদলেছে এবং এ পরিবর্তনের ফলে সমাজ ব্যবস্থা একস্তর থেকে অন্যস্তরে উন্নীত হয়েছে। এভাবেই কালক্রমে বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজের বিবর্তন ঘটেছে। এ বিবর্তনের মূলে রয়েছে মানুষের নানারকম কার্যকলাপ, বিচারবুদ্ধি ও কলাকৌশল উদ্ভাবন। আদিম সমাজে মানুষের একমাত্র কাজ ছিল খাবার সংগ্রহ করা। মানুষ প্রথমে বনজঙ্গল থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করত। মানুষ যখন থেকে হাতিয়ারের ব্যবহার আয়ত্ত করল, তখনই তা সমাজ জীবনকে মৌলভাবে প্রভাবিত করল। আদিম মানুষের নির্দিষ্ট কোনো বাসস্থান ছিল না। তারা সমাজে দল বেঁধে বাস করত এবং খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াত। পশুপালন থেকে ক্রমান্বয়ে কৃষিকাজ করার ফলে তাদের স্থায়ী বসতি গড়ে ওঠে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পশুপালন ও কৃষিকাজের ফলে তাদের উৎপাদিত বাড়তি ফসল বা পশু অন্যকে দেবার বিনিময়ে অন্যকিছু গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। অর্থাৎ বিনিময় প্রথা গড়ে ওঠে। এ লেনদেনের ফলে তাদের মাঝে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হয়। এসব জিনিসপত্র এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাবার যখন প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন জিনিসের বেচাকেনার জন্য একটি স্থানও নির্দিষ্ট হয়। এভাবে বাজার, গঞ্জ ও বন্দর গড়ে ওঠে। এতে সামাজিক পরিবেশের আদিরূপ বদলাতে থাকে। ধীরে ধীরে মানুষ কলকারখানা স্থাপন করে।

জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা ও সর্বক্ষেত্রে এর প্রয়োগের ফলে মানব সমাজ দ্রুত পরিবর্তন হতে শুরু করে এবং আধুনিক সমাজের রূপ লাভ করে।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের কী পরিবর্তন হয়?
 

ক. চিন্তাভাবনার	খ. আশা-আকাঙ্ক্ষার
গ. আদান-প্রদানের	ঘ. চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষার
- সমাজের কল্যাণের জন্য মানুষকে হতে হয়—
  - নিয়ম ও শৃঙ্খলাবদ্ধ
  - সহানুভূতিসম্পন্ন
  - উপকার করার মানসিকতাসম্পন্ন

### নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

### নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

আদিম যুগে মানুষ প্রকৃতি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করত। তাদের স্থায়ী বসতি ছিল না। বিবর্তনের ধারায় কৃষিকাজ ও পশুপালনের মাধ্যমে তাদের মাঝে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূচনা হয়। ধীরে ধীরে তাদের জীবনব্যবস্থা পরিবর্তিত হতে থাকে।

৩. আদিম সমাজে মানুষের একমাত্র কাজ কী ছিল?
- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| ক. খাবার সংগ্রহ করা   | খ. পশুপালন করা       |
| গ. ব্যবসা-বাণিজ্য করা | ঘ. হাতিয়ার তৈরি করা |
৪. আদিম সমাজ থেকে আধুনিক সমাজে উত্তরণের পেছনে যে উপাদান কাজ করে—
- জ্ঞানবিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা ও বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ
  - মানুষের নানারকম কার্যকলাপ ও কলাকৌশল উদ্ভাবন
  - ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার

### নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii                                  খ. i ও iii  
গ. ii ও iii                                ঘ. i, ii ও iii

### সৃজনশীল প্রশ্ন

১. কাজীপাড়া গ্রামের নোটন স্বপন, লাভলু এবং অন্যান্য কিশোর ছেলেরা মিলে ঠিক করল ১লা বৈশাখ উদ্‌যাপন করবে। সে উপলক্ষে হা-ডু-ডু, ফুটবল খেলা এবং গ্রামীণ মেলার আয়োজন করা হল। ফুটবল খেলার সময় বল স্বপনের মাথায় প্রচণ্ডভাবে আঘাত করায় স্বপন অসুস্থ হয়ে পড়ে। গ্রামের লোকজন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে পালাক্রমে স্বপনের সেবা করায় অল্পদিনেই সে সুস্থ হয়ে ওঠে। গ্রামের সকলের প্রতি স্বপনের পরিবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।
- ক. সমাজ কাকে বলে?
- খ. সামাজিক সম্পর্কের প্রধান একটি কারণ বর্ণনা কর।
- গ. স্বপনের সুস্থ হওয়ার ক্ষেত্রে সামাজিক বন্ধন কীভাবে কাজ করেছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. সমাজ ছাড়া মানুষ চলতে পারে না—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।



## দ্বিতীয় অধ্যায়

### প্রথম পরিচ্ছেদ

## মানবসমাজের বিবর্তন

অনেক বিজ্ঞানীর মতে, পৃথিবীর বয়স এখন আনুমানিক পাঁচ হাজার মিলিয়ন বা পাঁচ শত কোটি বছর। পৃথিবীতে মানুষ এসেছে প্রায় দুই মিলিয়ন বা বিশ লক্ষ বছর আগে। প্রায় বিশ হাজার বছর পূর্ব থেকে আধুনিক মানুষের যুগ শুরু হয়েছে। মানবসমাজের বিবর্তন ধারাকে কয়েকটি যুগে ভাগ করা হয়েছে। নিচে এগুলোর বর্ণনা দেওয়া হল।

### প্রস্তর যুগ

মানুষের কলাকৌশলের যাত্রা শুরু হয় পাথরের তৈরি হাতিয়ার দিয়ে। প্রস্তরের হাতিয়ার দিয়ে মানুষ বন্য জীবজন্তুদের পরাভূত করে। প্রস্তরের হাতিয়ার দিয়ে জীবিকা সংগ্রহের মাধ্যমে মানুষ তাদের জীবন সংগ্রাম শুরু করে। তাই মানব সমাজের এ যুগকে বলা হয় প্রস্তর যুগ। প্রস্তর যুগের শুরু হয় এখন থেকে প্রায় দশ লক্ষ বছর আগে। এর স্থায়িত্বকাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দ অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় ৫৫০০ বছর পূর্ব পর্যন্ত। প্রস্তর যুগকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হয়; যথা—প্রাচীন প্রস্তর যুগ, মধ্য প্রস্তর যুগ ও নব্য প্রস্তর যুগ।

### প্রাচীন প্রস্তর যুগ

প্রাচীন প্রস্তর যুগের স্থায়িত্বকাল ছিল দীর্ঘ। মধ্য প্রস্তর যুগ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছিল প্রাচীন প্রস্তর যুগ। প্রাচীন প্রস্তর যুগে মানুষ গৃহায় ও বনজঙ্গলে বাস করত। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াত। সে সময়ে ভাষার সাংকেতিক প্রচলন ছিল। তবে এ যুগের শেষের দিকে ভাঙা-ভাঙা শব্দ উচ্চারণ ও কণ্ঠস্বর প্রকাশের মাধ্যমে ভাষার বিকাশ ঘটতে থাকে। বনের গাছপালা থেকে ফলমূল সংগ্রহ এবং বনের পশু শিকার করে মানুষ জীবনধারণ করত। প্রথমে ছোট ছোট পশু শিকার করত। ধীরে ধীরে দলবদ্ধ হয়ে ম্যামথ, বাইসন, বলগা হরিণ প্রভৃতি বড় বড় পশু শিকার করত। এ যুগের মানুষের প্রধান হাতিয়ার ছিল পাথর। সেগুলো ছিল অমসৃণ, ভেঁতা ও এবড়োবেড়ো। এ যুগের হাতিয়ার ধারালো ছিল না। এ যুগে মানুষ পশু-শিকারের পাশাপাশি মাছ শিকার করত। মাছ শিকার করার জন্য তারা বাঁশ ও বেতের তৈরি হাতিয়ার ব্যবহার করত।

প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার ছিল আগুন। আগুনের ব্যবহার আয়ত্ত করার পরও দীর্ঘকাল পর্যন্ত মানুষ নিজের হাতে আগুন জ্বালাতে শিখেনি। আকাশে বিদ্যুৎচুম্বকে বজ্রপাত, দাবাগ্নি, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি থেকে আগুন সম্পর্কে তাদের ধারণা জন্মে। মানুষ যেদিন আগুনের ব্যবহার শিখল সেদিন থেকে মানুষের ক্ষমতা বেড়ে গেল। আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে আসা আগুন, আকাশ থেকে বজ্রপাত এবং দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা দাবানলের ভয়ংকর চেহারা মানুষ ও বন্যপ্রাণীদের কাছে ভীতিকর ছিল। কিন্তু মানুষ ক্রমে জানতে পারে যে আগুন মানুষের উপকারেও আসে। শীতে আগুন আরাম দেয়; আগুন দেখলে বন্যপশুরা ভয়ে পালায়; আগুন রাতের অন্ধকার দূর করে। সে থেকে প্রাকৃতিক উৎস হতে আগুন সংগ্রহ করে জিইয়ে রাখত এবং প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করত।

পাথর ভাঙার মধ্য দিয়ে মানুষ প্রথম আগুন জ্বালানোর কায়দা আবিষ্কার করে। চকমকি পাথর ঠুকে বা শুকনো কাঠের সঙ্গে কাঠ ঘষে মানুষ আগুন জ্বালাতে শেখে। আগুন আবিষ্কারের আগে মানুষ বন্য লতাপাতা, ফলমূল ও কাঁচা মাংস খেয়ে উদরপূর্তি করত। আগুন জ্বালাতে শিখে আগুন দিয়ে তারা মাংস পুড়িয়ে বা

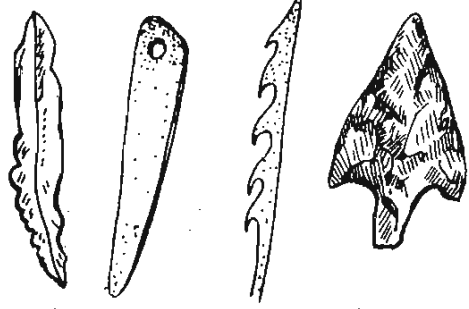


চিত্র ২.১ : মাটির পাত্র আগুনে পোড়ানোর দৃশ্য

ঝলসিয়ে খেতে শিখল। মানুষ আগুন ব্যবহার করতে শিখে খাদ্যব্যবস্থার কিছুটা উন্নয়ন সাধন করল। তা ছাড়া মাটির তৈজসপত্র আগুনে পুড়িয়ে সফলভাবে ব্যবহারের উপযোগী করে নিল। এ যুগের মানুষ প্রথমে গাছের ছাল-বাকল ও লতাপাতা দিয়ে পোশাকের কাজ চালায়। পরে পোশাক হিসেবে পশুর চামড়া ব্যবহার করত।

### মধ্য প্রস্তর যুগ

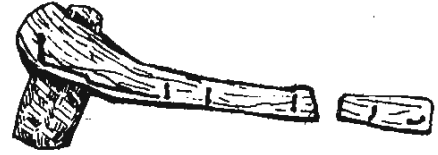
প্রাচীন প্রস্তর যুগের পর ২০ হাজার বছর ছিল মধ্য প্রস্তর যুগ। খ্রিস্টপূর্ব ১০ হাজার বছর পর্যন্ত এ যুগ স্থায়ী ছিল। এ যুগে মানুষ পাথরের ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করে। এ যুগে পাথরের তৈরি হাতিয়ার ও অন্যান্য সরঞ্জাম ব্যবহার করা হত। তীর-ধনুকের আবিষ্কার এ সময় হয়। এ যুগের মানুষের প্রধান হাতিয়ার ছিল পাথরের ফলা ও ছোট পাথরের নুড়ি যা তীরের অগ্রভাগে ব্যবহার করা হত। এ যুগেই মানুষ বন্যপশুর হাড় ভেঙে তৈরি করতে শিখে বল্লম, ছুরি, রঁগাদা, শূল প্রভৃতি হাতিয়ার। এ যুগেই মাটির পাত্রের ব্যবহার দেখা যায়। এ যুগেই জীবজন্তুকে পোষ মানাবার চেষ্টা শুরু হয়। এ যুগে ভাষার উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটে। মধ্য প্রস্তর যুগে পশু-শিকার প্রধান জীবিকা ছিল। জাল দিয়ে মাছ ধরা এ যুগে আরম্ভ হয়। হাত-জাল ও টান-জালের ব্যবহার ছিল। ছিপবঁড়শি দিয়ে মাছ ধরার প্রচলন এ যুগে ছিল।



চিত্র ২.২ : মধ্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার

### নব্য প্রস্তর যুগ

মধ্য প্রস্তর যুগের পরবর্তী ৭ হাজার বছরকে বলা হয় নব্য প্রস্তর যুগ। এ যুগেও মানুষকে একান্তভাবে পাথরের সরঞ্জাম ও হাতিয়ারের ওপর নির্ভর করতে হয়। এ যুগের পাথরের হাতিয়ারগুলো ছিল মসৃণ, সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ। ভোঁতা ও এবড়ো-থেবড়ো ছিল না। এ যুগের ব্যবহৃত হাতিয়ার অনেক উন্নতমানের ও পরিমার্জিত ছিল। উন্নতমানের হাতিয়ারের জন্য এ যুগের নাম নব্য প্রস্তর যুগ। নব্য প্রস্তর যুগের উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার হল বর্শা, হার্পুন, কুড়াল, কোদাল ও কাস্টে। পাথরের পাশাপাশি হাতিয়ার তৈরি করতে কাঠ, হাড় ও শেখের দিকে তামার ব্যবহার হত। এ সময়ে মানুষ কাঠ, ঘাস ও গাছের ডালপালা দিয়ে বাড়িঘর তৈরি করতে শেখে। পশমের কাপড় বুনতে শেখে। মাটি দিয়ে পাত্র তৈরি করতে শেখে। বনের পশুকে গৃহপালিত পশুতে রূপান্তর এ সময়ে করা হয়। এ যুগেই মানুষ কৃষিকাজ শেখে এবং ফসল উৎপাদন করতে পারে। এ যুগেই যাযাবর জীবনের অবসান ঘটে।



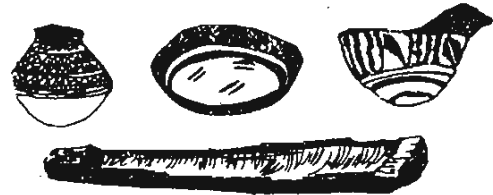
চিত্র ২.৩ : নব্যপ্রস্তর যুগের একটি কুড়াল। কাঠের হাতলে পাথরের ফলা বসিয়ে এই কুড়াল তৈরি করা হত।



চিত্র ২.৪ : নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার

নব্য প্রস্তর যুগে চাকার আবিষ্কার ঘটে। যানবাহন তৈরির ধারণা সৃষ্টি হয়। প্রথমদিকে কুকুরের টানা শ্লেজগাড়ির ব্যবহার ছিল। চাকার ব্যবহারের ফলে এই ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটে। এ যুগে ভাষার বিকাশ ঘটে এবং একটি নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে।

এ যুগের মানুষ কাঠের বাড়িঘরে ও গুহার দেওয়ালে নাচের ও নানা প্রকার জীবজন্তুর ছবি আঁকত। এরা ডোঙা, ভেলা এবং চামড়ার নৌকা তৈরি করত। এ সময় তাঁতের কাজ শুরু হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিময় প্রথার প্রচলন এ যুগে হয়। নব্য প্রস্তর যুগের এতসব উন্নতির জন্য একে নব্য প্রস্তর যুগের বিপ্লব বা নিউপোলিও বিপ্লব আখ্যা দেওয়া হয়।

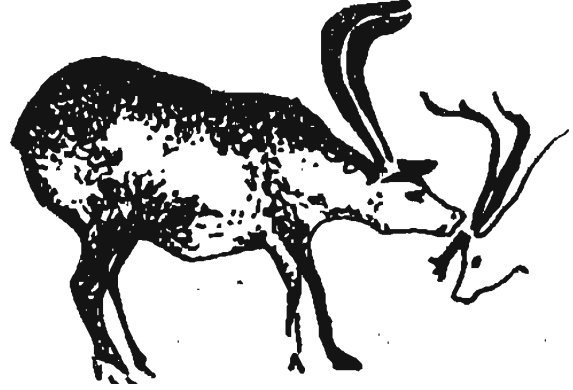


চিত্র ২.৫ : মাটির পাত্র ও ডোঙা নৌকা

এরপর ধাতুর যুগ শুরু হয়। এ যুগের সমাজ বিবর্তনের ধারা পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

লুইস হেনরি মর্গান মানব সমাজের বিবর্তনের ধারাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। যথা—বন্য, বর্বর ও সভ্য। বন্য ও বর্বর পর্যায়কে আবার নিম্ন, মধ্যম ও উচ্চ—এ তিন অবস্থায় ভাগ করা যায়। সমগ্র বন্য ও বর্বর যুগের নিম্ন ও মধ্যম অবস্থাকে প্রস্তর যুগ বলে গণ্য করা হয়।

নিম্ন বন্য অবস্থায় মানুষ কেবল বন্যজন্তু শিকার ও ফলমূল আহরণ করে খেত। মধ্য বন্য অবস্থায় মানুষ মাছ ধরা ও আগুন জ্বালাতে শেখে। উচ্চ বন্য অবস্থায় তীর-ধনুক আবিষ্কার করে এবং শিকারে দক্ষতা অর্জন করে।



চিত্র ২.৬ : গুহার দেওয়ালে বন্য হরিণ

নিম্ন বর্বর অবস্থায় মানুষ মৃৎপাত্র তৈরি করার কায়দা শিখে। মধ্য বর্বর যুগে জীবজন্তু পালন করে। কৃষিকাজ শিখে মধ্য বর্বর যুগেই; উচ্চ বর্বর যুগে এসেছে ধাতুর ব্যবহার।

বন্য যুগে তীর ও ধনুকের ব্যবহারের পর থেকেই মানুষ পশুর মাংসকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করল। আবার পাথরের তৈরি ধারালো অস্ত্র ও কুঠার এ যুগে চালু হল। বন্য যুগেই মানুষ বুঝতে পারে নিজের পরিবার-পরিজন নিয়ে বনে বনে ঘুরে না বেড়িয়ে ঘরবাড়ি নির্মাণ করাটাই ভালো। এ বন্য যুগেই মানুষ বুঝতে পারে প্রত্যেকের ঘরবাড়ি দূরে দূরে না হয়ে কাছাকাছি হওয়া প্রয়োজন। এভাবে বন্য যুগেই গ্রাম গঠন শুরু হল। এটুকু ছিল বন্য যুগে মানুষের অগ্রগতি।

মানুষ যখন মাটি দিয়ে পাত্র তৈরি করতে শিখল তখন থেকে বন্য যুগের শেষ হল এবং বর্বর যুগের শুরু হল। বর্বর যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বনের জন্তুকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত জন্তুতে পরিণত করা। এ সময়ে মানুষ নিজেদের বসবাসের কাছাকাছি গরু, মহিষ, ছাগল, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি প্রতিপালন করতে শুরু করল। যেসব স্থানে পশুদের খাদ্য ও বিচরণের জায়গা পাওয়া যেত সেসব স্থানে জনবসতি গড়ে উঠতে থাকে। সেখানে পশুখাদ্যের ভান্ডার শেষ হলে তারা আবার অন্য স্থানে চলে যেত। কিছুকাল পরে কৃষির মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন করতে শিখলে তাদের যাযাবর জীবনের শেষ হয়।

বজরা জাতীয় শস্যের চাষ এবং লাউ ও কুমড়া জাতীয় সবজির চাষ তারা করতে শেখে। এ সময়ের কৃষিকাজ ছিল খুবই অনুন্নত। লাঙলের প্রচলন তখনও হয়নি। এ যুগে পাথরের হাতিয়ারই ব্যবহার করে কৃষিকাজ করা হত। এ যুগ থেকে সভ্যসমাজের যাত্রা শুরু হয়।

এ যুগে শ্রমবিভাগ অর্থাৎ এক একটি বিশেষ কাজের ভার এক এক জনের ওপর ছিল না। আদিম যুগে সব কাজই সকলকে করতে হত। শ্রম বিভাগ যেটুকু ছিল তা নারী ও পুরুষদের মধ্যে। শিকার করা, মাছ ধরা, ঘর তৈরি করা, পাথরের হাতিয়ার তৈরি করা, যুদ্ধ করা—এসব পরিশ্রমের কাজ সাধারণত পুরুষেরা করত। গৃহের নানাবিধ কাজ, মাটির পাত্র তৈরি, ফসল উৎপাদন এবং কাপড় বুনানোর কাজ অর্থাৎ কম পরিশ্রমের কাজ করত নারীরা।

### খাদ্য সংগ্রহ ও উৎপাদন : সমাজের বিবর্তন

আদিম মানবসমাজ খাদ্যের সংস্থান করতে প্রথমে সংগ্রহ এবং পরে খাদ্য উৎপাদন কৌশল অবলম্বন করে।

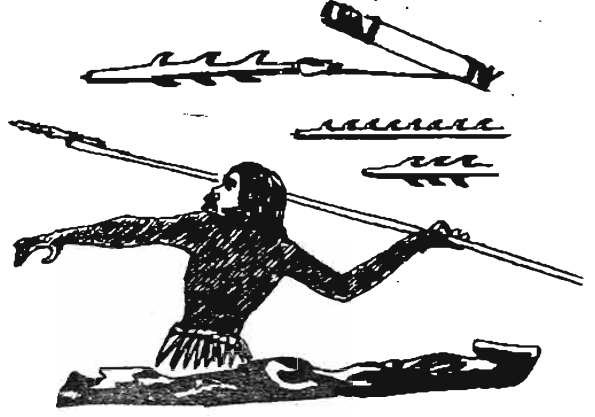
#### খাদ্যসংগ্রহ

খাদ্যসংগ্রহ কৌশলের মধ্যে ছিল ফলমূল আহরণ, মৎস্য শিকার, পশুপাখি শিকার। প্রাচীন প্রস্তর যুগে কয়েকশত সহস্র বছর মানুষ খাদ্য সংগ্রাহক হিসেবে কাটিয়েছে। আদিম মানুষ দলবদ্ধভাবে শিকার করত। জাল, ফাঁদ ও অন্যান্য কৌশল প্রয়োগ করে ছোটখাটো পশুপাখি শিকার করত। বিভিন্ন আদিম জনগোষ্ঠী বঁড়শি, জাল এবং বাঁশ, বেত ও কাঠের সরঞ্জাম মাছধরার কাজে ব্যবহার করত। শিকার ও মাছধরার সঙ্গে সঙ্গে তারা বন্য ফলমূল সংগ্রহ করত।

খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতি বন্য যুগ পর্যায়ের সীমাবদ্ধ থাকে। তিনটি উপায়ে তারা খাদ্য সংগ্রহ করত : (১) বনের গাছপালা থেকে ফলমূল সংগ্রহ, (২) নদীনালা ও খালবিল থেকে মাছ ধরা, (৩) বন্য পশু শিকার।

এ যুগে পাথর দিয়ে মানুষ শিকার করত। পাথর ছুড়ে পশুর আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষাও করত। পাথরের ওপর পাথর ঠুকে তারা ভাঙত। তারপর সেই পাথরের কিনারা অন্য পাথরে ঘষে ধারালো করত।

এ ধরনের পাথরের অস্ত্র দিয়ে আদিম মানুষ শত্রুর মোকাবেলা করত। তারা কাঠের লাঠি তৈরি করতে জানত। পশুর হাড় ও কাঠের লাঠির অগ্রভাগ ধারালো করে তারা মাটি খোঁড়ার শাবল তৈরি করত। এসব শাবল ও লাঠি ছিল আদিম মানুষের অন্যতম হাতিয়ার। এ সময়ে পাথরের তৈরি উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার ছিল দা, হাত-কুঠার ও বর্ষা। দূর থেকেই ছুটে পালানো জন্তুদের শিকার করা হত উড়ন্ত বর্ষা দিয়ে। লাঠির ডগায় হাড়ের ফলক লাগিয়ে তৈরি করত উড়ন্ত বর্ষা। এরপর তীর ও ধনুকের সাহায্যে মানুষ শিকারের কাজ করে। এ তীর ও ধনুক আবিষ্কারের পর থেকে বন্য জন্তু ও আকাশের উড়ন্ত পাখি শিকার করত। নতুন নতুন এসব হাতিয়ার ব্যবহারের ফলে আদিম মানুষের জীবনযাত্রার পদ্ধতি কিছুটা সহজ হয়।



চিত্র ২.৭ : হাতিয়ারের সাহায্যে শিকারের দৃশ্য

তারা নানা রকম পাথর, জীবজন্তুর শিং, চামড়া ইত্যাদি কেটে ও ঘষেমেজে নিজেদের কাজের উপযোগী করে তোলে।

আদিম সমাজে নদীর অববাহিকায় কৃষির উৎপত্তি ঘটে। কৃষিকে অবলম্বন করে মানবসভ্যতার শুরু হয়। ধান, গম, ভুট্টা পৃথিবীর কয়েকটি অঞ্চলে উৎপাদিত হতে থাকে।

প্রাচীন প্রস্তর যুগে মানুষের সময় কেটেছে শুধু নিজেদের পেটে আহার যোগাতে। সামান্য হাতিয়ার দিয়ে প্রকৃতির দেওয়া খাদ্য সংগ্রহ করে তাদের বাঁচতে হত। প্রকৃতির সম্পদ ব্যবহার করে খাদ্য উৎপাদন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

কিন্তু নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ প্রকৃতিকে কিছুটা আয়ত্তে বা বশে আনতে পারে। তারা পশুপালন ও কৃষিকাজের দ্বারা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে শিখল। তারা প্রকৃতির দেওয়া গাছের ফলমূলের ওপর আর সম্পূর্ণ নির্ভর করল না; নিজেরা জমি চাষ করে ও বীজ বুনে ফসল ফলাতে লাগল। তারা বনের পশু শিকারে আর খুশি থাকতে পারল না; গরু-ছাগল-ভেড়া পেলে, পুষে এবং বংশ বাড়িয়ে তারা খাদ্য উৎপাদন করতে লাগল। এভাবে পুরাতন প্রস্তর যুগের খাদ্য-সংগ্রহকারী মানুষ নব্য প্রস্তর যুগে খাদ্য-উৎপাদনকারী মানুষে পরিণত হল।

### খাদ্য উৎপাদন

খাদ্য সংগ্রহের পরবর্তীকালে মানুষ খাদ্য উৎপাদন শুরু করল। খাদ্য উৎপাদন পর্যায়কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা— (১) পশুপালন, (২) কৃষিকাজ, (৩) অকৃষি কাজ। নিচে এগুলোর বর্ণনা দেওয়া হল।

#### পশুপালন

পশুপালন সমাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়। আদিম মানুষ আহারের জন্য পশু শিকার করত। শিকারি মানুষ প্রথমে কুকুরকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত পশুতে পরিণত করে। কুকুর বাসগৃহের বিশুদ্ধ প্রহরী ও শিকারিদের সঙ্গী হয়ে ওঠে। বসতির আশেপাশে কোনো হিংস্র জীবজন্তু আসলে এসব কুকুর চিৎকার করে মানুষকে সতর্ক করে দিত। অনেক সময় বুনো ষাঁড়, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, গাধা প্রভৃতি পশু মানুষের হাতে ধরা পড়ত। সেগুলোকে ধরে নিয়ে এসে বেঁধে রাখত। এগুলোই ছিল তাদের জীবন্ত খাদ্যভান্ডার। যেদিন শিকার মিলত না, সেদিন বেঁধে রাখা পশু বধ করে তারা আহার করত।

মানুষ ক্রমে বুঝতে পারে যে গরু, ছাগল ও ভেড়াকে মেরে না ফেলে বাঁচিয়ে রাখা বেশি লাভজনক। এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখলে প্রতিদিন দুধ পাওয়া যায় এবং বছর বছর বাচ্চা পাওয়া যায়। তারা তখন থেকে কেবল বয়স্ক গরু খেতে আরম্ভ করল। এমন করেই পশুপালন প্রক্রিয়া শুরু হল, গৃহপালিত পশুর সংখ্যা ক্রমে বাড়তে লাগল এবং এগুলো পরিণত হল মানুষের সম্পদে।

তা ছাড়া ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি যাতায়াত, যুদ্ধ-চালনা ও মালপত্র বহনের কাজে ব্যবহার করা হত। যারা শুধু পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করত তারা ছিল যাযাবর।

### কৃষিকাজ

পশুপালন ও কৃষিকাজ নতুন যুগের সূচনা করে। শিকার ও প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল আদিম মানুষ ক্রমে কৃষিকাজের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন করতে শিখল। আগের যুগের পশু-শিকারের মাধ্যমে খাদ্যসম্পন্ন মানুষ পরিণত হল কৃষিকাজের মাধ্যমে খাদ্য-উৎপাদনকারীতে।

কৃষির সূচনা হয় মিশর, মেসোপটেমিয়া (বর্তমান ইরাক) ও ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। মনীষীদের মতে, আদিমকালে কৃষিকাজের সূচনা করে মেয়েরা। আদিম সমাজে ফলমূল আহরণের ভার ছিল মেয়েদের ওপর। পুরুষেরা যেত শিকারের সন্ধানে। ফলমূল সংগ্রহ করতে গিয়ে তারা কখনও নিয়ে আসত বুনো গম ও বার্লি, মেটে আলু, কচুর মূল ও কন্দ। আস্তানার আশেপাশে গম ও বার্লির যেসব দানা পড়ত তা থেকেও গজিয়ে উঠত চারাগাছ। চারাগাছে পরে দেখা দিত শিষ আর দানা। এ ধরনের ঘটনা থেকে বীজ ছিটিয়ে শস্য পাওয়ার ধারণার সৃষ্টি হয়। প্রথমে মেয়েরা তাদের বসবাসের আশেপাশে পতিত জমিতে একটি লম্বা চোখা লাঠি বা পশুর শিং দিয়ে মাটি চিরে গর্তে বীজ ফেলে সে বীজ থেকে ফসল ও ফলমূল উৎপাদন করত। তখন থেকে কৃষিকাজ শুরু হয়। কৃষিকাজের এ পর্যায়কে উদ্যান-চাষ বলে। আদিম যুগে প্রথমদিকে লাঙলের সাহায্যে জমি চাষ করা হত না। তখনকার দিনের আবাদের পদ্ধতিকে বলা যেতে পারে কোদাল-চাষ। জীবজন্তুর শিং বা লাঠির সঙ্গে ধারালো ও তীক্ষ্ণ পাথরের ফলক দড়ি দিয়ে বেঁধে তখনকার দিনের কোদাল তৈরি হত। এ কোদাল দিয়ে মাটি আলগা করে জমি চাষ করা হত। ফসল পাকলে জানোয়ারের চোয়ালের হাড় দিয়ে ফসল কাটত মেয়েরা। ক্রমে এটার অনুকরণে কাঠের কাস্তে ও ধারালো পাথরের কাস্তে আবিষ্কৃত হয়।



চিত্র ২.৮ : কৃষিকাজের সরঞ্জাম নব্য প্রস্তর যুগ

লাঙলের আবিষ্কার হয় আরও পরে খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার অব্দে। যেসব অঞ্চলে বন্যা হত এবং জমিতে পলি পড়ত, আদিম মানুষ এ পলিপড়া জমিতে গম ও বার্লির বীজ ছিটিয়ে দিত। এসব জায়গায় এ দুইটি শস্যই প্রচুর জন্মাত। এসব এলাকা ছিল নীলনদের তীর, সিন্ধু উপত্যকা ও তাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস (দজলা-ফোরাতে) নদীর অববাহিকা। সে যুগে পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হত। তাই কৃষিকাজ এসব অঞ্চলে ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে। পৃথিবীর এক এক জায়গায় এক এক ধরনের ফসলের চাষ হত। এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে হত ধান, জোয়ার ও মিষ্টি আলু। ককেশাস এবং এশিয়া মাইনর অঞ্চলে চাষ হত গম ও বার্লি। চাষাবাদ পরে আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু ও মধ্য আমেরিকাতে গোল আলু, শিম, কামরান্ডা জাতীয় তরকারি ও বীজের চাষ হত। বর্তমানকালে পরিচিত অনেক শস্য ও তরকারির আবাদ প্রাচীনকাল থেকেই শুরু হয়েছিল। কৃষিকাজের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পশুপালনের প্রয়োজনীয়তাও অনেক বেড়ে যায়। পশুপালন ও কৃষিকাজের সূচনা হলে মানুষের সমাজ জীবন ও সভ্যতার উন্নতি হতে থাকে। কৃষিকাজের দ্বারা খাদ্যের সংস্থান করা সহজ। তাই দলে দলে মানুষ কৃষিকাজকেই তাদের জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করে। এতে কৃষিকাজের উপযোগী স্থানগুলোতে লোকসংখ্যা বাড়তে থাকে। এভাবে একস্থানে অনেক লোকের একত্র বসবাস গড়ে ওঠে। মানুষের সংঘবন্দ্য জীবনযাত্রার সূত্রপাত ঘটে। আগে খাদ্যের সন্ধানে মানুষকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতে হত। কৃষিকাজ চালু হওয়ার পর চাষের দ্বারা প্রচুর পরিমাণে শস্য, তরিতরকারি ও ফলমূলের উৎপাদন হতে লাগল। তা ছাড়া মানুষ পশুপালনে অভ্যস্ত হওয়ায় খাদ্য হিসেবে গৃহপালিত পশুর দুধ এবং মাংস যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া সম্ভব হল।

কৃষিকাজের সূচনা মেয়েরা করলেও লাঙলের প্রচলন হলে পুরুষেরা জমি চাষের দায়িত্ব নেয়। তারা প্রথমে নিজের কাঁধে জোয়াল নিয়ে জমি চাষ করত। কালক্রমে হালের বলদ ব্যবহার শুরু হয়। লাঙল ও হালের বলদ ব্যবহার করে জমি চাষ করা হলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়তে থাকে। শুরুতে লাঙলের ফলা ছিল কাঠের। পরে পাথরের তৈরি ফলা জুড়ে দিয়ে উন্নততর চাষ ব্যবস্থা চালু করা হয়।

**অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড :** খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত হওয়ার পর সমাজের সকল ব্যক্তিই খাদ্য উৎপাদনে সরাসরি নিয়োজিত থাকল না। অনেকে কাপড় বুনন, মৃৎপাত্র তৈরি এমন সব অন্যান্য অকৃষি পেশায় নিয়োজিত হল। এভাবে ধীরে ধীরে জীবিকা সংগ্রহের পদ্ধতিও পরিবর্তন হতে লাগল। আদিমকালে মানুষের জীবিকা সংগ্রহের কাজ সহজসাধ্য ছিল। কিন্তু মানুষের অভাব ও প্রয়োজন ছিল সীমিত। তাই তারা স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল ছিল। আদিম সমাজে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রাচীন ও মধ্য প্রস্তর যুগে খাদ্য সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু নব্য প্রস্তর যুগে পশুপালন ও কৃষিকাজের সূচনা হলে খাদ্য উৎপাদন ও অকৃষি পেশায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত হয়।

আদিম অর্থনীতির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—

- (ক) **খাদ্য সংগ্রহকারী :** পশু শিকার, মৎস্য শিকার, ফলমূল সংগ্রহ প্রভৃতি কাজগুলোকে খাদ্য সংগ্রহকারী কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।
- (খ) **খাদ্য উৎপাদনকারী :** উদ্যান চাষ, পশুপালন, কৃষিকাজ ইত্যাদি খাদ্য উৎপাদনকারী কাজের অন্তর্ভুক্ত।
- (গ) **অকৃষি পেশা :** বাড়িঘর তৈরি, নৌকা তৈরি, পরিবহণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি আদিম সমাজে অকৃষি কাজ বলে চিহ্নিত।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

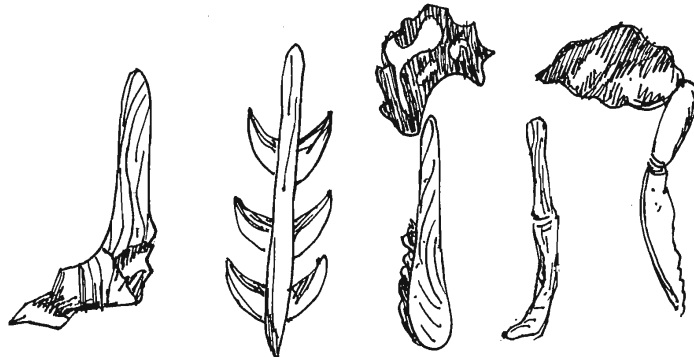
১. আদিম মানুষের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কী ছিল?
 

ক. আগুন	খ. কৃষিকাজ
গ. পাথরের অস্ত্র	ঘ. পশু শিকার
২. আদিম মানুষ যাযাবর জীবনের অবসান ঘটায়—
  - i. বনের পশুকে গৃহপালিত পশুতে রূপান্তরের মাধ্যমে
  - ii. কৃষিকাজ ও ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে
  - iii. মাটির পাত্রের তৈজসপত্র ব্যবহারের মাধ্যমে

### নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের চিত্রগুলো অনুসরণ করে ৩, ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।



৩. এগুলো কিসের চিত্র?

- ক. কৃষিকাজের সরঞ্জাম  
গ. বিভিন্ন ধরনের কুঠার

- খ. শিকারের হাতিয়ার  
ঘ. ঘর বানানোর সরঞ্জাম

৪. আদিম যুগে মানুষ মাটি খোঁড়া, আলাগা করা ও ফসল কাটত—

- i. জানোয়ারের চোয়ালের হাড় দিয়ে  
ii. জীবজন্তুর শিংয়ের সাহায্যে  
iii. লাঠির সঙ্গে ধারালো ও তীক্ষ্ণ পাথর বেঁধে

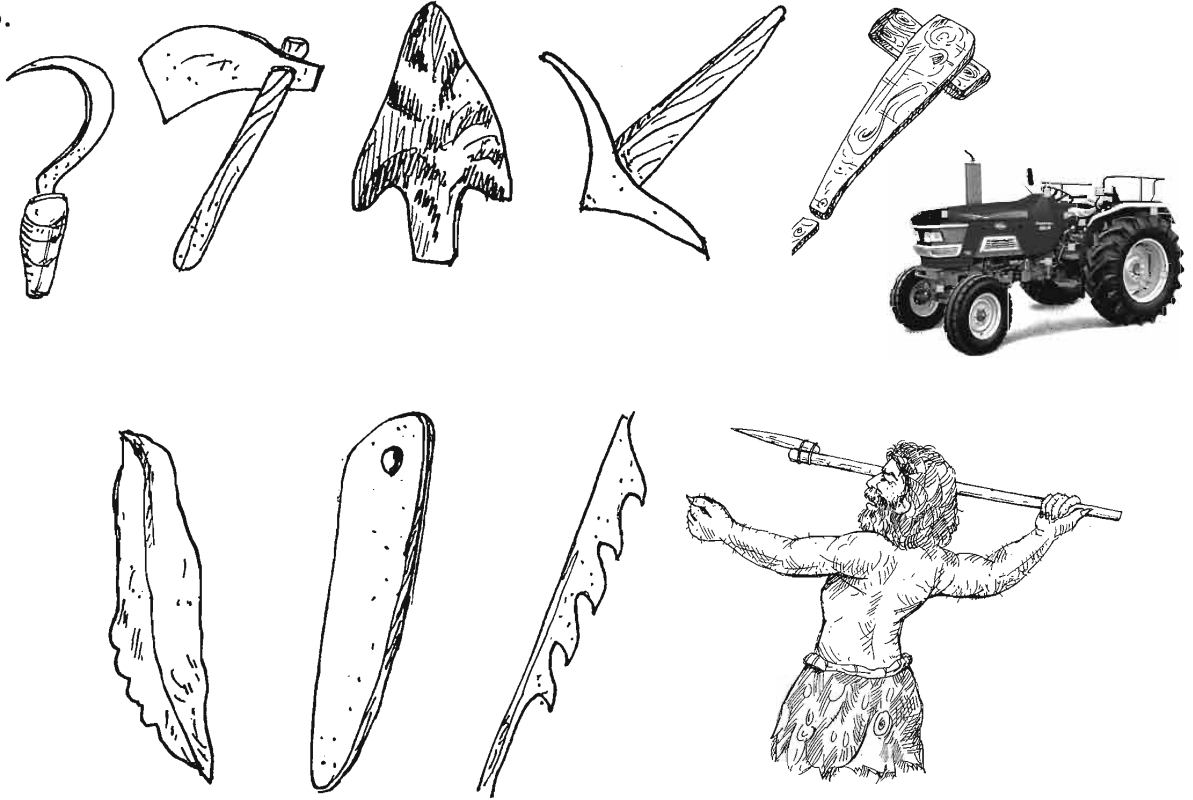
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii  
গ. ii ও iii

- খ. i ও iii  
ঘ. i, ii ও iii

### সৃজনশীল প্রশ্ন

১.



চিত্র

- ক. প্রস্তর যুগ কাকে বলে?  
খ. আদিম সমাজে খাদ্য সংগ্রহ ও খাদ্য উৎপাদনের একটি সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।  
গ. ওপরের ছবি থেকে আধুনিক কৃষিকাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম চিহ্নিত করে তাদের ব্যবহার বর্ণনা কর।  
ঘ. ওপরে প্রদর্শিত হাতিয়ারগুলোই আধুনিক যুগে ব্যবহৃত হাতিয়ারের উৎস— মতামত দাও।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিচিতি

### সংস্কৃতি

সংস্কৃতি বলতে কোনো সমাজের মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালী বোঝায়। ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মানুষ ভিন্ন ভিন্নভাবে জীবনযাপন করে। যেমন, কৃষি উৎপাদনকারী সমাজের মানুষের জীবনযাত্রা মৎস্য-শিকারি বা শিল্প-উৎপাদনকারী সমাজের মানুষের জীবনযাত্রা থেকে ভিন্নরকম। তাদের ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদে যেমন পার্থক্য আছে, তেমনি তাদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, চিন্তা-ভাবনা, জ্ঞান ও বিশ্বাসের মাঝেও পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ এক সমাজের মানুষের সংস্কৃতি অন্য সমাজের মানুষের সংস্কৃতি থেকে পৃথক।

সমাজে বসবাস করতে গিয়ে সমাজ থেকে মানুষ যা-কিছু লাভ করে তা হচ্ছে তার সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষ তার জীবনের উদ্দেশ্য অর্জন করে। সমাজের সদস্য হিসেবে অর্জিত আচার-ব্যবহার, জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতি-প্রথা, আইন, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদির সমষ্টিই হল সংস্কৃতি। আবার অন্যভাবে বলা যায়, মানুষ তার অভাব মোচনের জন্য যেসব কলাকৌশল আবিষ্কার করেছে, সেটাই তার সংস্কৃতি।

যেহেতু সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের জীবনপ্রণালী, অর্থাৎ সংস্কৃতি মানুষের জীবনযাত্রার একটি রূপরেখা দান করে, সেহেতু মানুষের সামাজিক সব চাহিদাই সংস্কৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজ জীবনে মানুষের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে সব কর্ম তাই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি মানুষের অস্তিত্বকে রক্ষা করে। মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীর সংস্কৃতি নেই। সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের অর্জিত আচরণ। সমাজ ব্যবস্থায় এ সংস্কৃতি এক পুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষে উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তায়। সমগ্র সমাজে এ সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে। সংস্কৃতি দুই ভাগে বিভক্ত—যথা, বস্তুগত ও অবস্তুগত। রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, উৎপাদন কৌশল হচ্ছে বস্তুগত সংস্কৃতি আর আচার-ব্যবহার, চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান ও বিশ্বাস হল অবস্তুগত সংস্কৃতি।

### সভ্যতা

মানুষের অনবরত চেষ্টার ফলে তার জীবনপ্রণালী উন্নতির পথে এগিয়ে চলে। বিজ্ঞান ও কলাকৌশলগত (প্রযুক্তিগত) নতুন নতুন আবিষ্কার ঘটে। উন্নত রাস্তাঘাট, যানবাহন, কলকারখানা, বাড়িঘর, স্কুল-কলেজ ও নগর-বন্দর গড়ে ওঠে। এভাবে সমাজ জীবনে সংস্কৃতির এক নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়। সংস্কৃতির এ উন্নতির অবস্থাকে বলে সভ্যতা। অন্য কথায় বস্তুগত সংস্কৃতি হচ্ছে সভ্যতা।

### সভ্যতা ও সংস্কৃতির পার্থক্য

- ১। মানুষ হিসেবে আমাদের জীবনযাত্রার প্রণালীকে সংস্কৃতি বলা হয় আর জীবনযাত্রার পথে আমরা যেসব উপকরণ ব্যবহার করি তা হল সভ্যতা।
- ২। সংস্কৃতি হল আমাদের পরিচয় আর সভ্যতা আমাদের সৃষ্টি।
- ৩। সভ্যতা হল মানুষের বাহ্যিক আচরণ আর সংস্কৃতি হল মানুষের ভেতরের রূপ।
- ৪। সভ্যতা পরিমাপ করা যায়, সংস্কৃতি পরিমাপ করা যায় না।
- ৫। সভ্যতার হুবহু স্থানান্তর ঘটা সম্ভব, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়।
- ৬। সহজেই সভ্যতার অংশীদার হওয়া যায় কিন্তু সহজে সংস্কৃতির অংশীদার করা যায় না।



## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সংস্কৃতি হল—

- i. আমাদের পরিচয়
- ii. মানুষের ভেতরের রূপ
- iii. মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালী

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

২. সংস্কৃতির উন্নততর অবস্থাকে কী বলা হয়?

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| ক. সভ্যতা            | খ. সংস্কৃতির উত্তরণ |
| গ. অবস্থাগত সংস্কৃতি | ঘ. অবস্থাগত সভ্যতা  |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

রহিমপুর গ্রামে যে ভাঙা সাঁকোটা ছিল, তার স্থলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে একটি ব্রিজ তৈরি হয়েছে। যার মাধ্যমে সে গ্রামের লোকদের শহরে যাতায়াতের পাশাপাশি অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পায়।

৩. ভাঙা সাঁকো থেকে ব্রিজের উত্তরণ যার নিদর্শন—

- i. সভ্যতার
- ii. সংস্কৃতির
- iii. প্রযুক্তগত উন্নতির

নিচের কোনটি সঠিক?

- |        |                |
|--------|----------------|
| ক. i   | খ. ii          |
| গ. iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪. পাকা সেতু রহিমপুর গ্রামের সংস্কৃতিতে কী ধরনের পরিবর্তন আনবে?

- |                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| ক. শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে    | খ. খাদ্যাভাসের পরিবর্তন হবে          |
| গ. পোশাক-পরিচ্ছদের পরিবর্তন হবে | ঘ. সামগ্রিক জীবনযাত্রার পরিবর্তন হবে |

### সৃজনশীল প্রশ্ন

জলিল ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। সে তার বাবা-মার সঙ্গে কল্লবাজারে থাকে। গত গ্রীষ্মের বন্ধে সে সিলেটে এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। সে অবাক হয়ে লক্ষ করল সিলেটের লোকদের জীবনযাত্রার ধরন, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ইত্যাদি কল্লবাজারের লোকদের চেয়ে আলাদা। তার বাবা বলেন, জীবনধারণের এইসব আলাদা কলাকৌশল হচ্ছে সংস্কৃতি। যে জাতির সংস্কৃতি যত উন্নত সে জাতি তত সভ্য।

- ক. সংস্কৃতি কী?
- খ. সভ্যতাকে বস্তুগত সংস্কৃতি বলা হয় কেন?
- গ. জলিলের অভিজ্ঞতার আলোকে এক এলাকার সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য এলাকার পার্থক্য হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. সভ্যতা ও সংস্কৃতি একটি আরেকটির পরিপূরক — বিশ্লেষণ কর।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ সভ্যতার উত্তরণ

প্রাচীন সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে। আফ্রিকার মিশর এবং এশিয়ার উপমহাদেশ মেসোপটেমিয়া, ভারত ও চীন প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি। কয়েকটি নদীর অববাহিকা প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান। তাই আদি সভ্যতা নদীর তীরবর্তী সভ্যতা নামে পরিচিত।

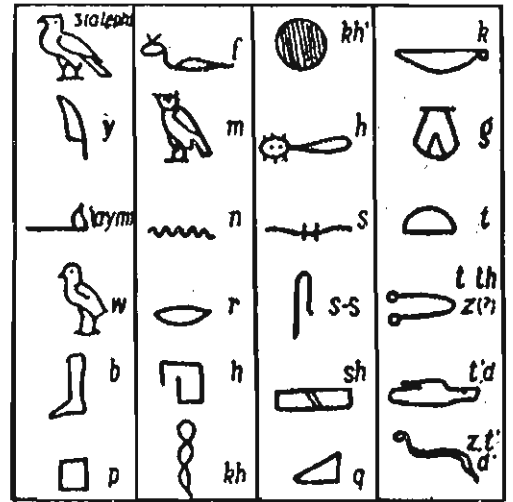
প্রাচীনকালে নরম ও উর্বর ভূমি এবং উষ্ণ আবহাওয়ার অঞ্চলে কৃষি বিকাশ লাভ করে। এসব অঞ্চলেই প্রথম সেদিনকার সভ্যতা গড়ে ওঠে। নীলনদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা, তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস (দজলা-ফোরাতে) নদী অববাহিকায় মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা, সিন্ধুনদের তীরে সিন্ধু সভ্যতা ও হোয়াংহো নদীর তীরে চৈনিক সভ্যতা এর উদাহরণ। আগুন ও হাতিয়ার ব্যবহারের ফলে মানুষের সভ্যতার সূচনা হয়। এ সভ্যতাকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যায় লিখন ও ধাতুর ব্যবহার। উদ্ভাবনী শক্তির বলে মানুষ এসব আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়।

### লিখন

প্রাচীনকালের মিশর ও সুমেরিয়ায় চিত্রলিখন পদ্ধতির প্রচলন হয়। মিশরীয়রা প্রথমে ছবি আঁকার মতো করে লিখন প্রচলন শুরু করে। এতে এক একটা ছবি আঁকার সাহায্যে এক একটা বিষয় বা বস্তুকে বোঝানো হত। ছবি এঁকে বস্তুকে বোঝানো যায় কিন্তু মনের ভাব বা চিন্তা ছবিতে প্রকাশ করা যায় না। তাই চিত্রলিখনে নির্দিষ্ট কোনো ধ্বনি বা শব্দাংশের চিহ্ন ব্যবহার আরম্ভ হয়। এ চিত্রলিপিকে বলা হয় হায়ারোগ্লিফিক। ধ্বনিচিহ্ন হিসেবে চব্বিশটি ব্যঞ্জনবর্ণের একটি বর্ণমালাও তারা আবিষ্কার করে। মিশরীয়রা তাদের লিখনপদ্ধতিতে কালি, কলম ও কাগজ ব্যবহার করত। রান্নার হাঁড়ির ঝুল একরকম আঠার সঙ্গে মিশিয়ে তারা কালি তৈরি করত এবং একধরনের নলখাগড়া কেটে কলম বানাত। প্যাপিরাস নামক একধরনের নলগাছের বাকল দিয়ে তারা সাদা রঙের কাগজও তৈরি করত।

সুমেরীয়রাও চিত্রলিখন পদ্ধতিতে লেখা শুরু করে। পরে তারা সাংকেতিক চিহ্নের প্রচলন করে। সুমেরীয়রা এবং তাদের সভ্যতার উত্তরাধিকার ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয়রা লেখার জন্য নলখাগড়ার ডগা ব্যবহার করত। নলখাগড়ার ডগা চৌকোণা করে কেটে কলমের মতো করে বানাত। সেই চৌকোণা ডগা দিয়ে মাটির তৈরি নরম ফলকে দাগ কেটে লিখত। লিখিত ফলকগুলো আগুনে পোড়ানো হত। পোড়ামাটির ফলকগুলো ইটের মতোই শক্ত হত এবং লেখা স্থায়ী হত।

সুমেরীয় ও প্রাচীনকালের ফিনিশীয়রা ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয়দের সংস্পর্শে আসে এবং তাদের লিখনপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়। ফিনিশীয়রা এসব লিখনপদ্ধতির সংস্কার করে এগুলোকে সহজ করে তোলে। প্রাচীনকালে এদের দ্বারাই বর্ণমালা বা অক্ষরের সাহায্যে লিখনপদ্ধতির প্রচলন ও বিস্তার ঘটে। তারা ২২টি ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহার করত। ফিনিশীয় লিপিমালায় কোনো স্বরবর্ণ ছিল না। প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী নামে দুই ধরনের লিপি। আমাদের বাংলা বর্ণমালা এসেছে ব্রাহ্মী লিপি থেকে।



চিত্র ২.৯ : প্রাচীন মিশরীয়দের হায়ারোগ্লিফিক লিপির নমুনা

লিখনপদ্ধতি প্রবর্তন হওয়ার ফলে সরকারি-বেসরকারি সবরকম লেনদেন, হিসাব-নিকাশ, চুক্তি ও সন্ধিপত্র লিখে রাখার উপায় বের হল। বিভিন্ন ঘটনা ও কাজকর্মের বিবরণ লিখে রাখার সুবিধা হল। খবরাখবর লিখে পাঠানো অথবা আদেশ-নিষেধ জারি করা সম্ভব হল। এভাবে মানুষের জ্ঞানকে লেখার আকারে ধরে রাখা এবং তা প্রচার করার উপায় পাওয়া গেল।

## ধাতুর ব্যবহার

নব্য প্রস্তর যুগের পর আসে ধাতু ব্যবহারের যুগ। ধাতুর আবিষ্কার ও ব্যবহার একটি বৈপ্লবিক ঘটনা। প্রস্তর যুগে পাথর দিয়ে হাতিয়ার তৈরি হত। খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দের পর পাথরের বদলে ধাতু দিয়ে হাতিয়ার তৈরি শুরু হয়। তখন থেকে হাতিয়ার তৈরির উপকরণ হয়ে ওঠে পাথরের বদলে ধাতু। তামা, দস্তা, ব্রোঞ্জ, লোহা ইত্যাদি হল ধাতু। নব্য প্রস্তর যুগের মাত্র কয়েক শত বছর তামার যুগ কাটে। পাথরের গা থেকে তামার আকর নিয়ে তাতে তাপ দিয়ে কাঁচা তামা বের করা হত। এ সময়ে তামার হাতিয়ার তৈরি হত। তামা আবিষ্কারের পথ ধরে মানুষ আবিষ্কার করে ব্রোঞ্জ। খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দে নিকট প্রাচ্যে ব্রোঞ্জ তৈরি হয়। লোহার আবিষ্কার হয় আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে।

ধাতু যুগে মানুষের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি। এ যুগে গ্রামের পাশাপাশি নগর গড়ে ওঠে। নগর সভ্যতার উদ্ভব ধাতু যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ধাতুর ব্যবহার চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন যুগের সূচনা হল। যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার ও তৈজসপত্র তৈরির কাজে প্রথমে তামা, তারপর ব্রোঞ্জ এবং সর্বশেষে লোহার ব্যবহার শুরু হয়। অলংকার তৈরির কাজে সোনা ও রূপার ব্যবহার ব্রোঞ্জের পরপরই শুরু হয়। পাথরের তৈরি যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ারের চেয়ে ধাতুর তৈরি যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ারের সুবিধা ছিল অনেক বেশি। কারণ ধাতু দিয়ে যে কোনো আকৃতির যে কোনো জিনিস তৈরি সম্ভব ছিল। কিন্তু পাথর দিয়ে তা তৈরি সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া ধাতু নির্মিত হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি পাতলা, চ্যাপ্টা, ধারালো বা সুচালো করা সম্ভব হত; কিন্তু পাথর দিয়ে সেরকম করা যেত না। পাথরের যন্ত্রপাতি বা অস্ত্র ব্যবহারের সময় অনেক সময় ভেঙে যেত এবং এক বার ভেঙে গেলে তা একেজো হয়ে পড়ত। কিন্তু ধাতুর তৈরি যন্ত্রপাতি বা অস্ত্র সহজে ভেঙে যায় না এবং ভেঙে গেলেও এগুলো মেরামত করা যায়।

খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে মিশর ও ব্যাবিলনে ব্রোঞ্জের হাতিয়ার ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হত। আর্মেনিয়া অঞ্চলে প্রথম লোহার হাতিয়ার তৈরি হয়।

ধাতু যুগের চাকা আরও উন্নত হয়। যখন চাকা ছিল না, মানুষকে পায়ে হেঁটে চলতে হত। জিনিসপত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বহিতে হত ঘাড়ে কিংবা ঘোড়া বা গাধার পিঠে করে। চাকার প্রচলনের ফলে চাকাওয়ালা শকট নির্মিত হয়। গরু বা ঘোড়ার টানা চাকাওয়ালা শকট মানুষকে গতি দেয়, মালপত্র দূরদূরান্তে নিতে সাহায্য করে। ধাতুর রাজা হল লোহা। মানুষ যেদিন লোহার আকর গলিয়ে লোহা তৈরি করতে শিখল সেদিন থেকে সে বুঝল লোহা অন্যসব ধাতু ও পাথরের চেয়ে বেশি কঠিন ও শক্তিশালী। সে থেকে লোহার প্রভাব পড়ে মানুষের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। প্রথমে পরিবর্তন আসে কৃষিতে। মানুষ দেখল যে কাঠের লাঙলে লোহার তীক্ষ্ণ ফলা যোগ করে দিলে জমি ভালোভাবে চাষ করা যায়। আবার লোহার তৈরি কুঠার দিয়ে গাছপালা কাটার কাজটি অনেক দক্ষতার সঙ্গে করা যায়। ফলে বনজঙ্গল পরিষ্কার করে চাষের জমি তৈরি করা এবং আগাছামুক্ত রাখার কাজটি সহজ হয়ে ওঠে। এভাবে কৃষির উৎপাদন বাড়তে বিপুল পরিমাণে। জল পরিবহণের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখা গেল। প্রস্তর যুগে মানুষ গাছের ডালপালা দিয়ে ভেলা ও ছোট নৌকা বানাতে শিখেছিল। কিন্তু লোহার ব্যবহারের ফলে লোহার কুঠারের সাহায্যে বড় গাছ কেটে বড় নৌকা তৈরির কাঠ সংগ্রহ করা গেল। আবার লোহার পেরেক জাতীয় জিনিস ব্যবহার করে নৌকাকে আরও মজবুত করে গড়ে তোলা সম্ভব হল। এ ছাড়া নৌকার ওপরের অংশে ধাতুর নানাবিধ ব্যবহার শিখে ফেলল। এভাবে বড় আকারের নৌকা নির্মাণ শুরু হল। এসব নৌকা চলাচল করতে লাগল নদী, খালবিল ও সাগরে। এতে যাতায়াত ও উৎপন্ন ফসল পরিবহণের সুবিধা হল।

ধাতুর ব্যবহারের যুগকে সভ্যতার যুগ বলা যায়। ধাতু যুগে সভ্যতা ব্যাপকতা লাভ করে। বর্তমানেও ধাতুর যুগই চলছে। বর্তমানকালে যেসব কলকারখানা, রেলগাড়ি, স্টিমার, লঞ্চ, সেতু, ইঞ্জিন ও যন্ত্রপাতি তৈরি করা হচ্ছে তা ধাতুর আবিষ্কার ও ধাতুর ব্যবহারের ফলেই সম্ভব হচ্ছে।

## নগরের উদ্ভব

নগর বলতে বোঝায় একটি সীমিত এলাকা যেখানে এক জনগোষ্ঠী স্থায়ীভাবে বসবাস করে। কৃষি ছাড়া অন্য পেশা বা কাজকর্ম করে নগরের বসবাসকারী লোকেরা জীবিকা নির্বাহ করে।

নব্য প্রস্তর যুগের মাঝামাঝি সময় থেকে নগর বিকাশের সূচনা হয়। পৃথিবীর কতকগুলো বিখ্যাত নদীর উপত্যকা বা অববাহিকা কৃষিকাজের জন্য উর্বর ভূমি ছিল। নীল নদের উপত্যকা বা মিশর ভূমি এবং দজলা (তাইগ্রিস) ও ফোরাতে (ইউফ্রেটিস) নদীর অববাহিকা ছিল উর্বর ভূমির অঞ্চল। প্রাচীনকালে ভারতীয় উপমহাদেশে সিন্ধু নদের উপত্যকা ও চীন দেশে হোয়াংহো ও ইয়াংসি নদীর অববাহিকাগুলো এমনি উর্বর ছিল।

কৃষিকাজের সূচনা হলে এসব অঞ্চলে জনবসতি দ্রুত বাড়তে থাকে। ফলে এসব স্থানে অসংখ্য গ্রাম, নগর ও জনপদের উদ্ভব হয়। এ কারণে এসব নদীর উপত্যকাগুলোতেই প্রাচীন সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটে।

যখন মানুষ নগর গড়ে বসবাস শুরু করেছে তখন মানুষের সভ্য অবস্থার সূচনা হয়। দজলা-ফোরাতে, সিন্ধু এবং নীল নদের উপত্যকাসমূহে প্রাচীনতম নগরের নিদর্শন পাওয়া যায়। এরপরই নগরের নিদর্শন পাওয়া যায় ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে। খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ থেকে ৫০০ অব্দের মধ্যে এ অঞ্চলে কতিপয় গ্রিক নগর গড়ে ওঠে। রোম ছিল প্রাচীন যুগের সবচেয়ে বড় নগর।

নগরের উদ্ভব ঘটেছে কৃষির উদ্ভবের ফলে। কৃষির উন্নতি হতে থাকলে খাদ্যের উৎপাদন বাড়তে থাকে। কৃষকেরা আপন প্রয়োজন মিটিয়ে এ উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য তখন অন্যের প্রয়োজনে সরবরাহ করতে পারে। কৃষিকাজে ধাতু ব্যবহারের ফলে কৃষির উৎপাদন বাড়ে এবং বাড়তি উৎপাদন সৃষ্টি হয়। মানুষ নতুন নতুন কলাকৌশল আবিষ্কার ও প্রয়োগের প্রচেষ্টা চালায়। এতে কিছু মানুষ শিল্পী, কারিগর, ব্যবসা ও অন্যান্য পেশাজীবীতে পরিণত হয়। এসব পেশায় মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তির উন্নতি নগর বিকাশে সাহায্য করে।

মানুষ যখন বিভিন্ন কাজে দক্ষতা লাভ করতে শিখল, অনেক মানুষ তখন আপন আপন কাজ বা পেশাকেই তাদের একমাত্র জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করতে আরম্ভ করল। ফলে সমাজে কামার, কুমার, তাঁতি, জেলে, কাঠমিস্ত্রি, স্বর্ণকার ইত্যাদি নানান পেশার উৎপত্তি হয়। এ অবস্থায় একে অপরের তৈরি বা উৎপন্ন জিনিসের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পরস্পরের মধ্যে তখন বিভিন্ন জিনিসপত্রের আদান-প্রদান জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূচনা হয় এবং ব্যবসায়ী শ্রেণীর উৎপত্তি হয়। ব্যবসায় প্রসার ঘটলে জিনিসপত্র বেচাকেনার জন্য হাটবাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। বাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে নতুন বসতি। জিনিসপত্র আনা-নেওয়ার জন্য চাকার গাড়ি, নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি তৈরি হয়। এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে জল বা স্থলপথে পণ্যদ্রব্যের চলাচল বা আনা-নেওয়া শুরু হয়। এভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য, বাজার ও ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানে নগর গড়ে ওঠে।

নব্য প্রস্তর যুগে ধর্মযাজকের আবির্ভাব ঘটে। ধর্মযাজকেরা বিভিন্ন স্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। মন্দিরগুলোকে কেন্দ্র করে ধাতু যুগে মন্দিরের আশেপাশে বিভিন্ন নগর গড়ে ওঠে।

## ধর্মবিশ্বাস

ধর্ম সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলে, মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্ব বাড়ায় আবার আত্মার শান্তি দান করে। ধর্মের মূল লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ সাধন করা। আদিমকাল থেকেই ধর্ম মানুষের জীবনের একটি অঙ্গ। ধর্মের সঙ্গে আছে মানুষের হৃদয় ও বিশ্বাসের সম্পর্ক। ধর্মের অস্তিত্ব নেই বা ছিল না—এমন কথা জানা যায় না। আদিম মানব সমাজে হাজার হাজার বছর ধরে ধর্মের অস্তিত্ব ছিল।

আদিম মানব সমাজে বিচিত্র ধরনের বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। কেউ পূর্বপুরুষকে দেবতা মনে করত; আবার অনেকে প্রাকৃতিক বস্তুকে পূজা করত। আদিম সমাজে ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল আত্মায় বিশ্বাস। আদিম মানুষেরা মনে করত যে, মানুষের মৃত্যু হলেও আত্মার মৃত্যু হয় না। মৃত ব্যক্তির আত্মার মধ্যে আছে শুভ ও অশুভ। শুভ আত্মা মানুষের মঙ্গল করে আর অশুভ আত্মা ধ্বংস ও ক্ষতিসাধন করে, এরা প্রেতাচার রূপ নেয়। আদিম মানুষের ধারণা আত্মা দেখা যায় না। কিন্তু যে কোনো বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে এরা যেখানে সেখানে যেতে পারে। জীবিত মানুষের ওপর ভর করে ক্ষতি বা উপকার করতে পারে। আদিম মানুষের কাছে আত্মা ও প্রেতাচার ছিল কৌতূহল, পুলক ও আতঙ্কের উৎস। তারা তাই আত্মার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের পূজা-অর্চনা করত।

আদিম মানুষ আত্মার বিশ্বাস থেকে পূর্বপুরুষ পূজা করত। পূর্বপুরুষ পূজাকে তারা ধর্মের অংশ মনে করত। তাদের বিশ্বাস ছিল মৃত পূর্বপুরুষকে পূজা করলে মঙ্গল হয়। তাই মৃত পূর্বপুরুষকে খুশি করার জন্য তারা পূজা করত।

আকাশ-পৃথিবী, আলো-বাতাস, আগুন-পানি, চন্দ্র-সূর্য, বজ্র-বৃষ্টি, নদ-নদী, পশু-পাখি, গাছ-পালা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুতে আত্মা-প্রেরণাদেবতার প্রভাব আছে বলে আদিম মানুষের বিশ্বাস ছিল। এ ধারণা থেকে প্রকৃতিপূজার সূচনা হয়।

আদিম যুগে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, মহামারি, ভূমিকম্প, বজ্রপাত প্রভৃতি দেখা দিত এবং তাদের ক্ষতিসাধন করত। আদিম মানুষের কাছে এসবের প্রতিকার ছিল না। এসব অশুভ শক্তিকে তারা ভয়, ভক্তি ও শ্রদ্ধা করত। তারা ধারণা করত, এগুলোর মধ্যে একটি অসাধারণ অতিপ্রাকৃত শক্তি রয়েছে। এ অতিপ্রাকৃত শক্তিকে খুশি করার জন্য আদিম মানুষ পূজা-অর্চনা, নৃত্যগীত, বলিদান প্রভৃতি আচার-অনুষ্ঠান করত।

এস্কিমোরা প্রেতের ভয়ে নানা ধরনের আচার-অনুষ্ঠান করত। মেলেনেশিয়ায় অন্য প্রেতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিজ পরিবারের শেষ মৃত আত্মীর প্রেতকে রক্ষাকর্তা হিসেবে মনে করা হত। প্রেতাত্মাদের মানুষের মতোই ক্ষুধা, পিপাসা ও আবেগ আছে বলে পূর্ব আফ্রিকার রাগাডারা বিশ্বাস করত। তাই তারা প্রেতাত্মার জন্য মন্দির নির্মাণ করত এবং সেখানে খাবার উৎসর্গ করত। প্রেতাত্মার পূজায় সব মানুষই মৃত্যুর পর পূজা পেত।

অনেক সমাজের গোত্রবাসী মনে করত তারা কোনো এক বিশেষ পূর্বপুরুষ টোটেম থেকে এসেছে। আফ্রিকার বান্টু সমাজের প্রত্যেক গোত্রেরই এক একটা পূর্বপুরুষের প্রেতাত্মার দেবতা ছিল। পলিনেশিয়ায় বিশ্বজগৎকে আকাশ, মাটি, পানি, বৃক্ষ, পাহাড় ও পর্বতের দেবতার মধ্যে ভাগ করত। আদিম সমাজে পুরোহিত পূজাও ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। এসব ছাড়া সে সময়ের ধর্মীয় বিশ্বাসে টোটেম, ট্যাবু ও মানা নামে এক অদ্ভুত ধারণা ছিল। টোটেম বলতে বোঝায় এমন কোনো প্রাণী, গাছপালা বা অন্যকিছু যাকে আদিম মানুষ তাদের পূর্বপুরুষ বলে মনে করত। কুসংস্কারবশে একে তারা পূজা করত। একে মারত না বা খেত না। তাদের ধারণা ছিল টোটেম বিপদ-আপদের রক্ষাকর্তা। অনেক সমাজে গোত্র পরিচিত হত টোটেম প্রতীকের মাধ্যমে। ট্যাবু হল একপ্রকার সতর্কবাণী বা বিপদসংকেত বা ধর্মীয় বাধানিষেধ আরোপের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আদিম মানুষের বিশ্বাস ছিল অতিপ্রাকৃত শক্তি মানুষের কল্যাণের জন্য কিছু করতে নিষেধ করে। এ ধরনের নিষেধ হল ট্যাবু। ট্যাবু ভঙ্গকারীকে অতিপ্রাকৃত শক্তি সাজা দিতে পারে বলে তাদের বিশ্বাস ছিল। পলিনেশিয়াতে ট্যাবু ভঙ্গ করা পাপ বলে মনে করা হত। ট্যাবু যেন কারফিউ আরোপের মতো এক ক্ষমতা। মানা বলতে বোঝায় একটি অস্বাভাবিক শক্তি বা ক্ষমতা। অনেকের ধারণা মানা-শক্তিতে বিশ্বাসই ধর্মের আদিরূপ; প্রেতে বিশ্বাস পরে সৃষ্টি হয়। যাদের মধ্যে অসাধারণ কিছু দেখা যায় তারাই মানা-শক্তির অধিকারী বলে তাদের বিশ্বাস ছিল।

প্রকৃতপক্ষে আদিম সমাজে অসংখ্য ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল এবং সে সময়ের ধর্মগুলো বৈচিত্র্যে ভরপুর ছিল।

### সামাজিক প্রতিষ্ঠান

সমাজে ব্যবহৃত রীতিনীতিকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলা চলে। আদিম মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করত প্রকৃতি। তারা দলবদ্ধভাবে বিপদ-আপদের মোকাবিলা করত। সমাজে ছোট ছোট দলের মধ্যে ছিল গভীর সম্পর্ক। এক দল আরেক দলকে বিপদে-আপদে সাহায্য ও সহযোগিতা করত। দলের নিয়মকানুন ও রীতিনীতি ছিল। কেউ দলের নিয়মকানুন ও রীতিনীতি অমান্য করলে তাকে শাস্তি পেতে হত। আদিম মানুষের সমাজে আচার-অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল এবং কতকগুলো নিয়ম গড়ে উঠেছিল। দলের কেউ মারা গেলে মৃতদেহ কবর দিত এবং মৃতদেহের সঙ্গে হাতিয়ার ও খাবার দিত। তারা মনে করত এতে মৃত ব্যক্তিটি আবার জীবিত হয়ে ফিরে আসবে। বড় কোনো পশু শিকার করলে শিকারের জন্তুকে ঘিরে নেচে নেচে তারা আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করত। বিয়ের রীতি আদিম সমাজে প্রচলিত ছিল। জাদুতে তাদের অগাধ বিশ্বাস ছিল। আদিম সমাজে গোত্র পরিচিত হত কোনো পশুপাখি, গাছপালা বা অন্যকিছুর নামে প্রতীকের মাধ্যমে। পরিচিতির প্রতীকটিকে টোটেম বলা হত। টোটেম হত্যা বা বিনাশে ট্যাবু ছিল। ট্যাবুর অর্থ হল নিষিদ্ধ।

কৃষিকাজের প্রয়োজনে স্থায়ী বসতি ও জনপদ গড়ে উঠলে এসব জনপদে বিশেষ গোত্র বা দলের লোক বাস করত। প্রত্যেক দল বা গোত্রে দলপতি বা গোত্রপ্রধান থাকত। দল বা গোত্রের প্রধান সমাজের তৈরি নিয়মকানুন ও গোত্রের প্রথা অনুযায়ী সমাজ পরিচালনা করত। দল বা গোত্রের প্রত্যেক লোককে সমাজের নিয়মকানুন বা প্রথা মেনে চলতে হত। ফলে মানুষ সমাজে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে জীবনযাপন করত।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. প্রথম লোহার হাতিয়ার কোথায় তৈরি হয়?

- ক. মিশরে  
গ. ভারতে

- খ. আর্মেনিয়ায়  
ঘ. চীনে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

সীমা ও নীলা ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী। তারা বর্ণমালার উৎপত্তি ও মানুষের মনের ভাবপ্রকাশের উপায় নিয়ে কথা বলছিল। সীমা বলল মিশরীয়রা মনের ভাব প্রকাশের জন্য হায়ারোগ্লিফিক চিত্রলিপি ব্যবহার করত।

২. নিচের কোনটি ভাব প্রকাশে সুমেরীয়দের উদ্ভাবন?

- ক. ছবি  
গ. ব্যঞ্জনবর্ণ

- খ. সংকেত  
ঘ. স্বরবর্ণ

৩. মানুষের জ্ঞানকে প্রকাশ করা যায়—

- i. ছবি আঁকায়  
ii. সাংকেতিক চিহ্নের ব্যবহারে  
iii. বর্ণমালার ব্যবহারে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i  
গ. i ও iii

- খ. i ও ii  
ঘ. i, ii ও iii

৪. কোথায় প্রাচীন সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটে?

- ক. এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে  
গ. আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশে

- খ. এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশে  
ঘ. আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশে

৫. ধাতু যুগে—

- i. উন্নতমানের হাতিয়ার তৈরি সম্ভব হয়  
ii. কৃষির সম্প্রসারণ হয়  
iii. নগর সভ্যতার উদ্ভব ঘটে

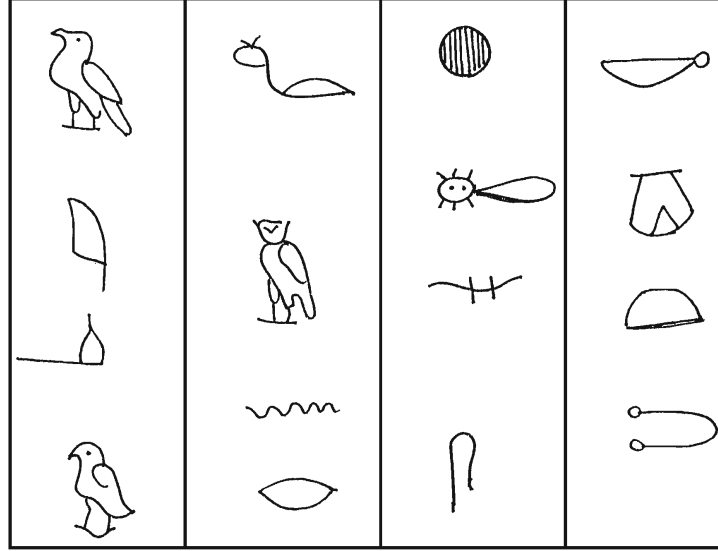
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i  
গ. ii ও iii

- খ. i ও ii  
ঘ. i, ii ও iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১.



চিত্র

ওপরের চিত্রের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

- ক. ওপরের চিত্রে কোন প্রাচীন লিপির নমুনা প্রকাশ পাচ্ছে?
  - খ. এই লিপি ব্যবহারের বর্ণনা দাও।
  - গ. বর্তমানে তুমি বাংলায় মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য যে ধরনের লিপি ব্যবহার কর তা একটি ছকে প্রকাশ কর।
  - ঘ. উল্লিখিত প্রাচীন লিপি অপেক্ষা বর্তমানে প্রচলিত লিপি ব্যবহার সুবিধাজনক—তোমার মতামত দাও।
২. নারায়ণগঞ্জ একটি সমৃদ্ধিশালী নগরী। এখানকার জলবায়ু পাট শিল্প ও বস্ত্র শিল্পের উপযোগী। যার কারণে বিভিন্ন কলকারখানা ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার পাশাপাশি এখানে বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর মানুষের উদ্ভব ঘটেছে। জল ও স্থলপথের যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় এখানে একটি উন্নত নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছে।
  - ক. সভ্যতা কাকে বলে?
  - খ. সভ্যতা গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ বর্ণনা কর।
  - গ. নারায়ণগঞ্জে কেন নগর সভ্যতা গড়ে ওঠে?
  - ঘ. একটি উন্নত নাগরিক সভ্যতা গড়ে ওঠার জন্য কী কী উপাদানকে তুমি জরুরি মনে কর? লিপির আবিষ্কার সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে — মতামত দাও।

## তৃতীয় অধ্যায় প্রাচীন যুগে ভারতীয় উপমহাদেশ

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও ভূটান নিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশ গঠিত। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসকে তিন ভাগে ভাগ করে পাঠ করা যায়—প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ। অতি প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন পর্যন্ত সময়কাল উপমহাদেশের ইতিহাসে প্রাচীন যুগ।

মুসলমানদের আগমনের পর থেকে ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়া পর্যন্ত সময়কাল মধ্যযুগের অন্তর্ভুক্ত। ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত সময়কালকে উপমহাদেশের ইতিহাসে আধুনিক যুগ ধরা হয়। আমরা এখন প্রাচীন যুগে ভারতীয় উপমহাদেশের সভ্যতা ও ইতিহাস সম্পর্কে ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

### প্রথম পরিচ্ছেদ সিন্ধু সভ্যতা

সিন্ধু সভ্যতার পরিচয় : সিন্ধু সভ্যতা ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে পুরোনো সভ্যতা। সুদূর অতীতে সিন্ধু নদ ও তার শাখাপ্রশাখা-বিধৌত অঞ্চলটিতে এক বিস্তীর্ণ জনবসতি গড়ে উঠেছিল। এ জনগোষ্ঠী বেশ কয়েকটি শহর গড়ে তুলেছিল। শহরকে কেন্দ্র করে তারা বেশ উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল। শহর বা নগরকেন্দ্রিক ছিল বলে এ সভ্যতাকে বলা হয় নগর সভ্যতা। এটি ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা। এখানে লোহার কোনো জিনিস পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ এ সভ্যতাটি লোহার আবিষ্কারের পূর্বের সভ্যতা। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দ পর্যন্ত এ সভ্যতা স্থায়ী হয়েছিল। এ সভ্যতা কারা গড়ে তুলেছিল সে সম্পর্কে পণ্ডিতগণ একমত নন। সাধারণত ধারণা করা হয়, দ্রাবিড় জাতি এ সভ্যতা গড়ে তুলেছিল।

সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার : দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ সভ্যতার কথা মানুষ জানত না। নানা কারণে এ সভ্যতা ধ্বংস হয়ে মাটিচাপা পড়ে গিয়েছিল। ১৯২১-২২ সালে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্যার জন মার্শাল মাটি খুঁড়ে এ সভ্যতার দুইটি শহর বের করেন। এ শহর দুইটির একটি সিন্ধু নদের তীরবর্তী মোহেন-জো-দারো। এটি পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় অবস্থিত। অন্য শহরটির নাম হরপ্পা। এটি সিন্ধু নদের উপনদী রাভী'র তীরে অবস্থিত। হরপ্পা পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের মন্টগোমারি জেলায় অবস্থিত। পরবর্তীকালে মাটি খুঁড়ে ভারত ও পাকিস্তানের আরও কিছু অঞ্চলে সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে।

নগর পরিকল্পনা : মোহেন-জো-দারো থেকে হরপ্পার দূরত্ব প্রায় ৬৪৪ কিলোমিটার। শহর দুইটির মধ্যে এত দূরত্ব থাকলেও এদের মধ্যে বেশ মিল দেখতে পাওয়া যায়। দুইটি শহরেরই নগর-পরিকল্পনা প্রায় একই ধরনের। রাস্তাগুলো ছিল সোজা এবং বেশ চওড়া। মোহেন-জো-দারোতে ৯ ফুট থেকে ২৪ ফুট (৩ মিটার থেকে ১০ মিটার) পর্যন্ত চওড়া রাস্তা আবিষ্কৃত হয়েছে। উভয় শহরেই রাস্তার দুই পাশে দোতলা তিনতলা বাড়ি ছিল। এ সকল বাড়িঘর বিভিন্ন কামরায় ভাগ করা ছিল। প্রতি বাড়িতে ছিল চৌবাচ্চাসহ সুন্দর গোসলখানা, কূপ, উঠান ইত্যাদি। দুইটি শহরেই পাকা নর্দমা ছিল। প্রত্যেক বাড়ি থেকে ছোট নর্দমা দিয়ে পানি বের হয়ে এ নর্দমায় পড়ত। রাস্তা, নর্দমা, কূপ, দালান ইত্যাদি পোড়া ইট দিয়ে তৈরি ছিল। দুইটি শহরেরই পশ্চিমাংশ ছিল পূর্বের অংশ থেকে উঁচু। উঁচু অংশে ধনী এবং নিচু অংশে শ্রমিক ও কারিগর শ্রেণীর লোক বাস করত। মোহেন-জো-দারোতে একটি বৃহৎ স্নানাগার এবং হরপ্পাতে একটি বড় খাদ্যগুদাম পাওয়া গেছে।



**অধিবাসীদের পেশা :** সিন্ধু সভ্যতার বেশিরভাগ লোক কৃষিকাজ করত। তারা খাদ্যশস্য ও তুলা উৎপাদন করত। খালের মাধ্যমে তারা জমিতে সেচের ব্যবস্থা করেছিল। কৃষিকাজ ছাড়াও লোকজনের মধ্যে কেউ কেউ পশুপালন করত, আবার কেউবা কাপড় বুনত। তারা তামা, ব্রোঞ্জ ও সোনা দিয়ে নানারকম জিনিসপত্র ও গয়না তৈরি করত। তারা মাটির জিনিসপত্র তৈরি করায় খুব দক্ষ ছিল। তারা দৈনন্দিন কাজে মাটির তৈরি হাঁড়িপাতিল, থালাবাসন ইত্যাদি ব্যবহার করত। তারা মাটি দিয়ে নানা ধরনের খেলনাও তৈরি করত। এ সকল হাঁড়িপাতিল, থালাবাসন, খেলনা ইত্যাদি আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করা হত। এগুলোকে বিভিন্ন রং দিয়ে ও নকশা কেটে সুন্দর করা হত। সিন্ধু সভ্যতার লোকদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল অভিজ্ঞ নাবিক ও ব্যবসায়ী।

**ধর্ম :** সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীগণ সাপ ও বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করত। মৃত ব্যক্তিকে কবর দেওয়া এবং পোড়ানো দুইরকম প্রথাই চালু ছিল।

**সীলমোহর :** মোহেন-জো-দারো ও হরপ্পায় হাড় ও পাথরের তৈরি অনেক সীলমোহর পাওয়া গেছে। এ সকল সীলমোহরে মানুষ ও বিভিন্ন গৃহপালিত পশুর চিত্র খোদাই করা আছে। এগুলোতে একধরনের লেখাও রয়েছে। পণ্ডিতগণ এখনও এ সকল লেখা পাঠ কিংবা তার অর্থ বের করতে পারেননি। এগুলো পাঠ করে অর্থ বের করা সম্ভব হলে অনেক অজানা কথা আমরা জানতে পারব।

সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের কারণ: কীভাবে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয় সে বিষয়ে পণ্ডিতগণ সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। হয়তো বাইরের কোনো শত্রুর আক্রমণ অথবা কোনো প্রচণ্ড ভূমিকম্প কিংবা ভয়াবহ কোনো বন্যার ফলে এ সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। এসব কারণের মিশ্র প্রভাবেও এ সভ্যতা ধ্বংস হয়ে থাকতে পারে।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সিন্ধু সভ্যতার অপর নাম কী?

ক. নগর সভ্যতা

খ. পাথর সভ্যতা

গ. লোহার সভ্যতা

ঘ. মাটির সভ্যতা

২. সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হওয়ার কারণ—

i. বহিঃশত্রুর আক্রমণ

ii. প্রচণ্ড ভূমিকম্প

iii. ভয়াবহ বন্যা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩, ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

মোহেন-জো-দারো ও হরপ্পা নামে দুটি একই ধরনের শহর সিন্ধু সভ্যতার উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। এখানের বেশিরভাগ লোক কৃষিকাজ করত। এছাড়া তারা বিভিন্ন ধরনের পেশায় নিয়োজিত ছিল।

৩. মোহেন-জো-দারো থেকে হরপ্পার দূরত্ব কত?

ক. ৬৪২ কিলোমিটার

খ. ৬৪৩ কিলোমিটার

গ. ৬৪৪ কিলোমিটার

ঘ. ৬৪৫ কিলোমিটার

৪. সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা কৃষিকাজ ছাড়া আরও অনেক কাজে নিয়োজিত ছিল। যেমন তারা—

- i. খাদ্যশস্য ও তুলা উৎপাদন করত
- ii. মাটি দিয়ে নানারকম তৈজসপত্র তৈরি করত
- iii. তামা, ব্রোঞ্জ ও সোনা দিয়ে নানারকম গয়না তৈরি করত

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৫. মোহেন-জো-দারো ও হরপ্পার মধ্যে মিল রয়েছে—

- i. নগর পরিকল্পনায়
- ii. একই ধরনের সীলমোহর ব্যবহারে
- iii. ধর্ম পালনে

নিচের কোনটি সঠিক?

- |        |                |
|--------|----------------|
| ক. i   | খ. ii          |
| গ. iii | ঘ. i, ii ও iii |

### সৃজনশীল প্রশ্ন

মনে কর তুমি 'ক' শহরে বাস করছ। এখানে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোক বাস করে। পানি নিষ্কাশনের জন্য নর্দমা আছে। আছে পরিকল্পিত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। প্রাচীনকালের সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে 'ক' শহরের পরিকল্পনার যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

- ক. ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা কোনটি?
- খ. সিন্ধু সভ্যতা কীভাবে আবিষ্কৃত হয়? ব্যাখ্যা কর।
- গ. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত 'ক' শহরের সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার একটি তুলনামূলক চিত্র অঙ্কন কর।
- ঘ. সিন্ধু সভ্যতার আরেক নাম ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা—বিশ্লেষণ কর।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# আর্যদের আগমন ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব

**আর্যদের আগমন :** সিন্ধু সভ্যতার পর ভারতীয় উপমহাদেশে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার নাম আর্য সভ্যতা। সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আর্য সভ্যতাকেই ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে পুরোনো সভ্যতা বলে মনে করা হত।

আর্যগণ এশিয়া বা ইউরোপের কোনো এক জায়গা থেকে এসে ভারতীয় উপমহাদেশে বসতি স্থাপন করে। তারা স্থানীয় অধিবাসীদের পরাজিত করে সিন্ধু নদের অববাহিকায় বসতি স্থাপন করে। সিন্ধু, শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা ও সরস্বতী—এ সাতটি নদনদীকে আর্যগণ ‘সপ্তসিন্ধু’ বলত। তারা এ সাতটি নদীবিধৌত অঞ্চলকে নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। এজন্য এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ চলেছিল অনেক দিন ধরে। অবশেষে এ অঞ্চলের লোকজন হার মেনে বনজঙ্গলে পালিয়ে যায়। তাদের কিছু অংশ আর্যদের দাসে পরিণত হয়। আর্যগণ ছিল লম্বা আকৃতির। তাদের গায়ের রং ছিল ফর্সা এবং নাক ছিল খাড়া। তারা নিজেদের অপরাপর জনগোষ্ঠীর চেয়ে সেরা মনে করত। নিজেদের ছাড়া অন্যদের তারা বলত অনার্য। অনার্যদের তারা দস্যু, অসুর, রাক্ষস ইত্যাদি হিসেবে অভিহিত করেছে।

## আর্য সমাজ ও ধর্ম

**আর্যদের সামাজিক জীবন :** পরিবারকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল আর্যদের সামাজিক জীবন। তাদের পরিবার ছিল ‘পিতৃতান্ত্রিক’ অর্থাৎ পিতাই ছিলেন পরিবারের কর্তা। মাতাপিতা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন নিয়ে পরিবার গঠিত হত। পরিবারের কর্তাকে বলা হত ‘গৃহপতি’। কতকগুলো পরিবার নিয়ে একটি গোত্র গঠিত হত। একটি গোত্র সাধারণত একই অঞ্চলে বাস করত। পিতৃতান্ত্রিক হলেও আদি আর্য সমাজে নারীর খুব সম্মান ছিল। নারীগণ স্বামীর সঙ্গে ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য পারিবারিক কাজে অংশ নিত। পুরুষের ন্যায় নারীদেরও শিক্ষার অধিকার ছিল। সাধারণত পুত্রসন্তান আশা করলেও আর্যগণ কন্যাসন্তানকে অবহেলা করত না। সমাজে বাল্যবিবাহ চালু ছিল না। পুরুষেরা অনেক বিয়ে করতে পারত। নারীগণ একটির বেশি বিয়ে করতে পারত না।

**চারটি শ্রেণী :** কালক্রমে আর্য সমাজে চারটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণগণ ছিল সমাজের বর্ণশ্রেষ্ঠ। তারা পুরোহিত হিসেবে পূজা-অর্চনা করত। যারা অস্ত্রচালানো শিখত এবং যুদ্ধে অংশ নিত তারা ছিল সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণী। তাদেরকে বলা হত ক্ষত্রিয়। সমাজের তৃতীয় শ্রেণীকে বলা হত বৈশ্য। তারা কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্য করত। আর এ তিন শ্রেণীর যারা সেবা করত তাদেরকে বলা হত শূদ্র। পরাজিত অনার্যগণ শূদ্র শ্রেণীভুক্ত ছিল।

**চারটি আশ্রম :** ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এ তিনটি উচ্চ শ্রেণী বা বর্ণকে জীবনের চারটি স্তর কঠোরভাবে পালন করতে হত। জীবনের চারটি স্তরের প্রত্যেকটিকে বলা হত ‘আশ্রম’। জীবনের চারটি স্তরকে ‘চতুরাশ্রম’ বলা হত। এ চতুরাশ্রম ছিল ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। জীবনের শুরুতে আর্য বালককে গুরুর নিকট এসে বিদ্যাশিক্ষা করতে হত। জীবনের এ স্তরকে বলা হত ‘ব্রহ্মচর্যআশ্রম’। বিদ্যা শিক্ষালাভের পর আর্য যুবক ঘরে ফিরে গৃহীর জীবনযাপন করত। জীবনের এ স্তরের নাম ছিল ‘গার্হস্থ্যআশ্রম’। জীবনের তৃতীয় স্তরকে বলা হত ‘বাণপ্রস্থআশ্রম’। এ পর্যায়ে আর্য প্রৌঢ় গৃহীজীবন ছেড়ে দিয়ে বনে কুটির বেঁধে বাস করত। জীবনের সর্বশেষ পর্যায়ে আর্যগণ সংসারের মায়া একেবারেই ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বরচিন্তায় নিয়োজিত হত। জীবনের এ স্তরকে বলা হত ‘সন্ন্যাস’।

**আর্যদের পেশা :** আর্যগণ মূলত গ্রামীণ জীবনযাপন করত। কৃষিকাজ ও পশুপালন ছিল তাদের প্রধান পেশা। দুধ, ঘি, ফলমূল, যব ও গম ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। তারা সূতি ও পশমি কাপড় পরত। নারীগণ সোনা ও রূপার গয়না পরত। তারা নাচ-গান পছন্দ করত। দৌড়-ঝাঁপ, শিকার, তীর ছোড়া, বর্শা নিক্ষেপ, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতিতে তারা খুব আনন্দ পেত।

**আর্যদের ধর্মীয় জীবন :** আর্যদের ধর্ম ছিল সহজ সরল। তারা মূর্তিপূজা করত না। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে তারা দেব-দেবী মনে করে পূজা করত। স্বর্গের দেবতা দ্যৌ, জলের দেবতা বরুণ, বজ্রের দেবতা ইন্দ্র, ঝড়ের দেবতা মরুৎ, আলোর দেবতা সূর্য এবং ভোরের দেবী উষার তারা উপাসনা করত। আগুনে ঘি ঢেলে তাতে তারা শস্য, পিঠা ইত্যাদি উপাচার দেবদেবীর উদ্দেশে উৎসর্গ করত। পরবর্তীকালে তাদের ধর্মীয় জীবনে বহু পরিবর্তন ঘটে।

**আর্যদের ধর্মগ্রন্থ :** আর্যদের ধর্মগ্রন্থের নাম বেদ। তারা বিশ্বাস করত যে, বেদ কোনো মানুষের রচনা নয়। বেদের চারটি অংশ, যথা—ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব।

### বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। এ সময় বৈদিক যুগের সহজ সরল ধর্মের কথা ভুলে যায়। আর্য সমাজে ছিল কঠোর বর্ণবৈষম্য। ব্রাহ্মণগণ নিজেদের সমাজের সেরা মনে করত। ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণদের বাড়াবাড়িতে খুবই অসন্তুষ্ট ছিল। তাই এ সময় পূর্ব ভারতে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হয়। দুইটি ধর্মেরই প্রচারক ছিলেন দুই জন ক্ষত্রিয় রাজকুমার। এখানে বৌদ্ধধর্মের জন্ম কীভাবে হল সে সম্পর্কে বর্ণনা করা হল।

### গৌতম বুদ্ধের জীবনী

বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক ছিলেন গৌতম বুদ্ধ। কপিলাবস্তুর শাক্যবংশে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম শুম্ভোধন এবং মায়ের নাম মায়াদেবী। রানী মায়াদেবী কপিলাবস্তু থেকে পিতার রাজ্য নেপালে যাচ্ছিলেন। পথে লুম্বিনী গ্রামে তাঁর এক সন্তানের জন্ম হয়। এ সন্তানটির জন্মের পরেই মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। সন্তানটি বিমাতা ও মাসি গৌতমী কর্তৃক লালিত-পালিত হয়। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল সিদ্ধার্থ। গৌতমী কর্তৃক লালিত-পালিত বলে তাঁর অপর নাম গৌতম। শাক্যবংশে জন্ম বলে তাঁকে শাক্যসিংহও বলা হয়।

ছোটবেলা থেকেই সিদ্ধার্থ ছিলেন চিন্তাশীল এবং সংসারের প্রতি উদাসীন। তাঁকে সংসারের প্রতি আগ্রহী করার জন্য তাঁর সঞ্জে যশোধরা নামে এক অত্যন্ত সুন্দরী রাজকন্যার বিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও তিনি সংসারের প্রতি আগ্রহী হলেন না। মানুষের দুঃখকষ্ট, রোগ, শোক, মৃত্যু ইত্যাদি দেখে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর যখন উনিশ বছর বয়স, তখন তাঁর একটি ছেলে জন্মাল। ছেলেটির নাম রাখা হয় রাহুল। তিনি ভাবলেন রাহুলের জন্য তাঁর মায়ী তাঁকে সংসারে জড়িয়ে ফেলতে পারে। তাই তিনি এক রাতে কাউকে কিছু না জানিয়ে ঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়লেন।

তিনি বিহারের নানা স্থানে ঘুরে নানা গুরুর নিকট থেকে অনেক কিছু জানলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁর মনে শান্তি আসল না। এরপর তিনি গয়ার নিকট উরুবিল্ব নামক স্থানে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হল না। অবশেষে তিনি নিরঞ্জনা নদীতে স্নান করে এক বিরাট পাকুড় গাছের নিচে ধ্যানে বসলেন। দীর্ঘ ছয় বছর ধ্যানের পর ৩৫ বছর বয়সে তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করলেন। তিনি তাঁর প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলেন। তখন থেকে তাঁর নাম হল বুদ্ধ বা জ্ঞানী। যে গাছের নিচে বসে তিনি ধ্যান করেছিলেন সে গাছটির নাম রাখা হয় 'বোধিবৃক্ষ'। স্থানটির নাম রাখা হয় বুদ্ধ গয়া। গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম।

বাকি জীবন গৌতম বুদ্ধ তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। ধর্ম প্রচারকালে মগধরাজ বিম্বিসার, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ প্রমুখের সঞ্জে তাঁর দেখা হয়। বহু লোক তাঁর শিষ্য হয়। ৮০ বছর বয়সে গোরক্ষপুরে গৌতম বুদ্ধের মৃত্যু হয়।

### বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি

বুদ্ধদেব চারটি মহাসত্যের কথা বলেছেন। এগুলো হচ্ছে : (১) মানুষের জীবনে দুঃখ আছে, (২) দুঃখের অবশ্যই কারণ আছে, (৩) দুঃখের অবসান করতে হবে এবং (৪) দুঃখকষ্ট অবসানের উপায় জানতে হবে।

গৌতম বুদ্ধের মতে, মানুষের দুঃখের কারণ হল 'আসক্তি' বা 'তৃষ্ণা'। কোনো কিছু পাওয়ার আশা করার নামই আসক্তি। আসক্তির অবসান হলে দুঃখ থেকে মুক্তি আসবে। দুঃখ থেকে মুক্তির নাম 'নির্বাণ লাভ'। নির্বাণ লাভের উপায় হল 'মধ্যম পন্থা' বা মধ্যপথ অনুসরণ করা। বুদ্ধের মতে এ মধ্যপথ হল আটটি। এগুলো হচ্ছে : (১) সং সংকল্প, (২) সং চিন্তা, (৩) সং বাক্য, (৪) সং ব্যবহার, (৫) সং জীবনযাপন, (৬) সং চেষ্টি, (৭) সং দর্শন এবং (৮) সম্যক সমাধি। বৌদ্ধ মতে অহিংসা পরম ধর্ম এবং জীবহত্যা মহাপাপ।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের নাম ত্রিপিটক। ত্রিপিটকের তিনটি অংশ : সূত্র পিটক, বিনয় পিটক এবং অভিধর্ম পিটক।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বুদ্ধদেব কয়টি মহাসত্যের কথা বলেছেন?  
 ক. ২ টি  
 খ. ৪ টি  
 গ. ৬ টি  
 ঘ. ৮ টি
২. আর্য সমাজে বৈষম্য পরিলক্ষিত ছিল—  
 i. অর্থ  
 ii. বর্ণ  
 iii. ওজন

### নিচের কোনটি সঠিক?

- |           |             |
|-----------|-------------|
| ক. i      | খ. ii       |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

### নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

পৃথিবী সৃষ্টির লগ্ন থেকে এ পর্যন্ত প্রায় বেশ কয়েকটি ধর্মাবলম্বী লোকের বসতি গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের বিভিন্ন নাম ও আদর্শ রয়েছে। প্রচলিত ধর্মগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, হিন্দু।

৩. বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের নাম কী?  
 ক. ত্রিপিটক  
 খ. কুরআন  
 গ. গীতা  
 ঘ. বাইবেল
৪. গৌতম বুদ্ধের মতে, মানুষের দুঃখের কারণ—  
 ক. অসৎ ব্যবহার  
 খ. আসক্তি বা তৃষ্ণা  
 গ. সম্পদের অপরিপক্বতা  
 ঘ. অভাব বোধ

### সৃজনশীল প্রশ্ন

সাবির সাহেব ছুটিতে ছেলেমেয়েদের রামুতে বৌদ্ধমন্দির দেখাতে নিয়ে গেলেন। গৌতমবুদ্ধের জীবনাদর্শ ও বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বলতে গিয়ে একপর্যায়ে মন্দিরের পুরোহিতরা বিভিন্ন কক্ষ ঘুরিয়ে বুদ্ধের বিভিন্ন অবস্থার মূর্তি দেখালেন। সাবির সাহেব বললেন ‘দুঃখ’ থেকে মুক্তি বা নির্বাণ লাভের উপায় হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মনীতির উল্লেখযোগ্য অবদান।

- ক. বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক কে ছিলেন?
- খ. গৌতমবুদ্ধ কীভাবে দিব্যজ্ঞান লাভ করেন?
- গ. সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় গৌতমবুদ্ধের জীবনাদর্শের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের জন্য নির্বাণ লাভ গুরুত্বপূর্ণ কেন? বিশ্লেষণ কর।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ মৌর্য সাম্রাজ্য

**ইতিহাসের উপাদান :** ভারতীয় উপমহাদেশে মৌর্য শাসনের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার লিখিত উপাদান খুব বেশি নেই। মেগাস্থিনিসের বিবরণ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও অশোকের একাধিক লিপিমালার মৌর্য যুগের ইতিহাস সম্পর্কে জানার গুরুত্বপূর্ণ উৎস বা উপাদান।

**চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (খ্রিস্টপূর্ব ৩২৮—খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ) :**

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম সাম্রাজ্যের নাম মৌর্য সাম্রাজ্য। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই ভারতের প্রথম সম্রাট।

**চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বংশ পরিচয় :** চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বংশ-পরিচয় সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ একমত নন। পুরাণ থেকে জানা যায় যে, চন্দ্রগুপ্তের মায়ের নাম ছিল মুরা। তিনি ছিলেন মহাপদ্মনন্দের শূদ্রাণী স্ত্রী। সে হিসেবে চন্দ্রগুপ্ত নন্দ-বংশেরই সন্তান। তাঁর মা মুরার নামানুসারে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম মৌর্য বংশ হয়েছে। জৈনগ্রন্থ থেকে জানা যায়, চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন ময়ূরপোষক এক গোষ্ঠীর দলপতির সন্তান। এ মতানুসারে, ময়ূর কথা থেকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম মৌর্য বংশ হয়েছে। বৌদ্ধ লেখকগণের মতে, চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবিগণের মৌর্য নামক এক ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মৌর্য বংশে জন্ম বলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশ মৌর্য বংশ নামে পরিচিত। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বৌদ্ধ লেখকদের মতই গ্রহণ করেছেন।

**চন্দ্রগুপ্তের প্রথম জীবন :** চন্দ্রগুপ্তের প্রথম জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। বৌদ্ধ লেখকগণ বলেছেন যে, কোনো এক যুদ্ধে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তখন তাঁর অসহায় মা তাঁকে নিয়ে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে (পাটনা) চলে যান এবং সেখানেই চন্দ্রগুপ্ত বড় হতে থাকেন। এ সময় মগধের রাজা ছিলেন ধননন্দ। তিনি ছিলেন খুবই অত্যাচারী। চন্দ্রগুপ্ত তাঁর অত্যাচার থেকে দেশকে বাঁচাতে চাইলেন। এ ব্যাপারে তিনি গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের সাহায্য চান। আলেকজান্ডার তখন পাঞ্জাবে ছিলেন। কিন্তু আলেকজান্ডার চন্দ্রগুপ্তের ওপর খুশি হলেন না। তিনি তাকে হত্যা করার আদেশ দেন। চন্দ্রগুপ্ত কোনো রকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। তিনি বিন্ধ্য পর্বতে আশ্রয় নেন। সেখানে চাণক্য নামে এক অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। চাণক্যও নন্দরাজার হাতে অপমানিত হয়েছিলেন। সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক হয়ে গেল। তাঁদের দুই জনের চেষ্টায় একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়ে উঠল। এরপর এ সৈন্যবাহিনী নিয়ে ধননন্দের সঙ্গে তাঁরা যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে ধননন্দ পরাজিত ও নিহত হন। চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বসলেন। চাণক্য হলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী।

**উপমহাদেশ থেকে গ্রিক বিতাড়ন :** মগধের রাজা হওয়ার পর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য পশ্চিম ভারত থেকে গ্রিকদের তাড়িয়ে দেন। এর ফলে পাঞ্জাব ও সিন্ধু চন্দ্রগুপ্তের দখলে আসে।

**চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য জয় :** উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে গ্রিকদের তাড়িয়ে দেওয়ার পর চন্দ্রগুপ্ত মালব ও সৌরাষ্ট্র (সুরাট) জয় করেন। এরপর তিনি দক্ষিণ ভারতের দিকে নজর দেন। দক্ষিণ ভারতে অভিযান চালিয়ে তিনি মহীশূর পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। এভাবে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

**সেলিউকসের সঙ্গে যুদ্ধ :** সেলিউকস ছিলেন আলেকজান্ডারের সেনাপতি। আলেকজান্ডারের কোনো সন্তান ছিল না। তাই আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। সাম্রাজ্যের পূর্বাংশ পড়ে সেলিউকসের ভাগে। উপমহাদেশের যে সকল এলাকা আলেকজান্ডার দখল করেছিলেন চন্দ্রগুপ্ত তা কেড়ে নেওয়ায় সেলিউকস খুব রেগে যান। তিনি তা আবার দখল করার জন্য আসেন। ফলে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। কিন্তু যুদ্ধে সেলিউকস পরাজিত হন। তখন দু পক্ষের মধ্যে সন্ধি হয়। সন্ধি অনুযায়ী সেলিউকস চন্দ্রগুপ্তকে মাকরান, কাবুল, কান্দাহার ও হিরাত ছেড়ে দেন। এর বিনিময়ে চন্দ্রগুপ্ত সেলিউকসকে পাঁচশো হাতি উপহার দেন। কথিত

আছে যে, সেলিউকস তাঁর কন্যা হেলেনকে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে বিয়ে দেন। সেলিউকস মেগাস্থিনিস নামক এক জন দূতকেও চন্দ্রগুপ্তের দরবারে পাঠান।

**চন্দ্রগুপ্তের শাসন ব্যবস্থা :** চন্দ্রগুপ্ত একজন সুশাসক ছিলেন। তিনি প্রজাদের খুব ভালোবাসতেন। দেশে প্রাচুর্য ছিল। চুরি-ডাকাতি ছিল না। প্রজারা সুখে-শান্তিতে বাস করত। সুশাসনের জন্য চন্দ্রগুপ্ত বিশাল সাম্রাজ্যকে চারটি প্রদেশে ভাগ করেন, যথা—উত্তরাপথ, দক্ষিণাপথ, প্রাচ্য ও অবন্তী। প্রত্যেক প্রদেশের জন্য এক জন করে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। সাধারণত রাজকুমারগণই প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োজিত হতেন। তবে সকল ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতেন সম্রাট নিজে। তিনি অমাত্যদের সাহায্যে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল একটি অত্যন্ত সুন্দর শহর।

**চন্দ্রগুপ্তের শেষ জীবন ও মৃত্যু :** শেষ জীবনে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য জৈনধর্ম গ্রহণ করেন। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে মহীশূরের শ্রাবণ বেলাগোলা নামক স্থানে জৈনধর্ম অনুসারে উপোস করার ফলে তাঁর মৃত্যু হয়।

**চন্দ্রগুপ্তের চরিত্র ও কৃতিত্ব :** চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল দৃঢ়। সামান্য অবস্থা থেকে জীবন শুরু করে নন্দবংশকে ধ্বংস করে তিনি মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। গ্রিকদের পরাজিত করে তিনি উপমহাদেশকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করেন। এজন্য তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করে তিনি সর্বপ্রথম সাম্রাজ্য স্থাপন করেন এবং রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিশাল সাম্রাজ্য সুশাসনেরও তিনি ব্যবস্থা করেন। তিনি প্রজাদের দীর্ঘ শাসক ছিলেন।

### সম্রাট অশোক (খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩–খ্রিস্টপূর্ব ২৩২ অব্দ) বিন্দুসার

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর শাসনকালের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে ঐতিহাসিকদের ধারণা তিনি সফল শাসক ছিলেন। তিনি প্রায় সাতাশ বছর রাজত্ব করেন।

**অশোকের রাজ্যলাভ :** বিন্দুসারের পর তাঁর ছেলে অশোক মৌর্য সাম্রাজ্যের সম্রাট হন। সিংহাসনে বসার চার বছর পর তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়।

**কলিঙ্গ জয় :** অভিষেকের আট বছর পর তিনি কলিঙ্গ দেশ জয়ের জন্য বের হন। কলিঙ্গবাসী প্রাণপণে বাধা দিয়েও পরাজিত হয়। কলিঙ্গ অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত হল। কিন্তু এই যুদ্ধে প্রায় এক লক্ষ কলিঙ্গবাসী নিহত এবং প্রায় দেড় লক্ষ বন্দি হয়। তা ছাড়া অসংখ্য লোক যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়।

**বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ :** কলিঙ্গ যুদ্ধের এ ভয়াবহতা দেখে অশোকের মনে দুঃখ হল। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন জীবনে আর যুদ্ধ করবেন না। তিনি তাঁর পুত্র-পৌত্রাদিকেও যুদ্ধ না-করার আদেশ দিলেন। তিনি উপগুপ্ত নামক এক ভিক্ষুর নিকট বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন। অশোক রাজ্যজয় না করে ধর্ম দিয়ে মানুষের মন জয় করতে চাইলেন।

**অশোকের চরিত্র ও কৃতিত্ব :** অশোক পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট। প্রজাগণকে তিনি নিজ সন্তানের মতো ভালোবাসতেন। বাসতেন। তিনি বলতেন, ‘সকল মানুষই আমার সন্তান’। প্রজাদের পার্থিব উন্নতি এবং পরকালের শান্তিই ছিল তাঁর শাসনের লক্ষ্য। শাসনের ব্যাপারে তিনি পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের নীতি অনুসরণ করেন। তবে ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি ‘ধর্মমহামাত্র’ এবং ‘রাজুক’ নামক দু ধরনের কর্মচারী নিযুক্ত করেন। তাঁর নির্দেশে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পর্বতের গায়ে কিংবা স্তম্ভে নীতিকথা খোদাই করে দেওয়া হয়েছিল। জীবে দয়া, মাতাপিতার প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য, সততা, সংযম প্রভৃতি নীতিকথা তিনি প্রচার করেন। সকল ধর্মের লোক তাঁর কাছে সমান মর্যাদা পেত। মানুষ এবং পশুপাখির জন্য তিনি চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। রাস্তার পাশে তিনি অসংখ্য গাছ লাগিয়েছিলেন। তা ছাড়া, তিনি বহু কূপ খনন এবং পান্থশালা তৈরি করেছিলেন। মানুষ এবং পশুপাখির উপকারে আসতে পারে এমন ঔষধি রোপণের ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। অশোক দণ্ডবিধির কঠোরতা কমিয়ে দেন। অশোকের মতো প্রজাহিতৈষী শাসক দুনিয়ার ইতিহাসে খুব কমই পাওয়া যায়।

### মৌর্য যুগের কৃতিত্ব

**রাজনৈতিক ঐক্য :** মৌর্য যুগ উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ যুগে উপমহাদেশে প্রথম রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয়। ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা এক কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আসে।

**গ্রিক বিতাড়ন :** গ্রিকদের এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া মৌর্যদের একটি অসাধারণ কৃতিত্ব। এর ফলে ভারতীয় সাম্রাজ্য ভারতের বাইরেও বিস্তার লাভ করে। পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে পশ্চিমে হিরাৎ এবং উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত মৌর্য সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে।

**শাসন ব্যবস্থা:** এ বিশাল সাম্রাজ্যের সুশাসনের ব্যবস্থাও মৌর্য সম্রাটগণ করেছিলেন। মৌর্য যুগেই উপমহাদেশের সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। উপমহাদেশের পরবর্তী শাসন ব্যবস্থা মৌর্য শাসন ব্যবস্থার আলোকেই পরিচালিত হয়। মৌর্য যুগে প্রজাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত সচ্ছল ছিল। মৌর্য বংশের তৃতীয় সম্রাট অশোকের শাসনামলে বৌদ্ধধর্ম রাজধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি পায়। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বুদ্ধের বাণী প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তাঁর চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মের মর্যাদা পায়। বিশ্বশান্তি স্থাপনে অশোক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ভারতের ভেতরে অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও বিনা বাধায় স্ব স্ব ধর্ম পালন করতে পারত। এ যুগে প্রজাদের ওপর কোনোরূপ অত্যাচার করা হত না। প্রজাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল কামনাই ছিল অশোকের শাসনের মূল লক্ষ্য।



## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

# গুপ্ত সাম্রাজ্য

### চন্দ্রগুপ্ত :

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের প্রায় পাঁচশো বছর পর গুপ্ত বংশ ক্ষমতায় আসে। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের শুরুতে গুপ্ত বংশের উত্থান হয়। এ বংশের প্রথম শক্তিশালী শাসক ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত। তিনি ৩২০ সাল থেকে ৩৪০ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁকেই গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

### সমুদ্রগুপ্ত (৩৪০-৩৮০ সাল)

চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর সমুদ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি ৩৪০ সাল থেকে ৩৮০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৪০ বছর রাজত্ব করেন।

**সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যবিস্তার :** সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী রাজা। সিংহাসনে বসেই তিনি রাজ্য বিস্তারে মন দেন। প্রথমে তিনি উত্তর ভারত জয় করেন। উত্তর ভারতের রাজ্যগুলো তিনি সরাসরি শাসন করতেন। এরপর তিনি মধ্য ভারতের বনময় অঞ্চল জয় করেন। অবশেষে তিনি দক্ষিণ ভারত জয়ে বের হন। দক্ষিণ ভারতের বার জন রাজা সমুদ্রগুপ্তের কাছে পরাজিত হন। তারা সমুদ্রগুপ্তের প্রতি অনুগত হন এবং কর দিতে রাজি হন। সমুদ্রগুপ্ত তাদেরকে স্ব স্ব রাজ্যে বহাল রাখেন। মালব ও সৌরাষ্ট্রের শক ও কুষাণ রাজাগণ সমুদ্রগুপ্তের কাছে নতি স্বীকার করেন। সিংহলের (বর্তমান শ্রীলঙ্কার) রাজা মেঘবর্মণ সমুদ্রগুপ্তের কাছে মূল্যবান উপহার পাঠান এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে বুদ্ধগয়ায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জন্য একটি মঠ তৈরি করে দেন। দক্ষিণ ভারতে জয় সম্পন্ন করে সমুদ্রগুপ্ত ‘অশ্বমেধ যজ্ঞ’ করেন। সমুদ্রগুপ্তকে প্রাচীন ভারতের ‘নেপোলিয়ন’ বলা হয়।

সমুদ্রগুপ্তের চরিত্র ও কৃতিত্ব : সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন সাহসী বীর ও সাম্রাজ্যের সংগঠক। তিনি অতিশয় প্রজাদরদী শাসক ছিলেন। তিনি তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যে সুশাসনের ব্যবস্থা করেন। তাঁর শাসনামলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম আবার নতুন জীবন পায়।

মুদ্রায় তাঁর বীণাবাদনরত মূর্তি প্রমাণ করে যে তিনি গান খুব ভালোবাসতেন। অনুরূপভাবে মুদ্রায় তাঁর সিংহহত্যাকারী মূর্তি প্রমাণ করে যে তিনি শিকার করা খুব পছন্দ করতেন। দেবদেবীর মূর্তিযুক্ত তাঁর অনেক স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক হলেও তিনি অন্যান্য ধর্মের লোকদের ওপর কোনো প্রকার অত্যাচার করেননি।

### দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৮০-৪১৫ সাল)

সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসেন। তাঁর পিতামহের নামও ছিল চন্দ্রগুপ্ত। এজন্য তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নামে পরিচিত। তিনি ৩৮০ সাল থেকে ৪১৫ সাল পর্যন্ত ৩৫ বছর অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে রাজত্ব করেন। তিনি ‘বিক্রমাদিত্য’ উপাধি গ্রহণ করেন। বিক্রমাদিত্য কথার অর্থ বিক্রমে ‘আদিত্য’ বা সূর্যের মতো। তাঁর উপাধি থেকে বোঝা যায় যে তিনি খুব ক্ষমতামণ্ডলী সম্রাট ছিলেন।

**দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যজয় :** দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শক ক্ষত্রপ বা রাজাদের পরাজিত করে মালব ও সৌরাষ্ট্র জয় করেন। এ জয়ের ফলে ভারতে বিদেশী শাসনের অবসান হয়। শকদেরকে পরাজিত করায় তিনি ‘শকারি’ নামে পরিচিত হন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত মালবের উজ্জয়িনীতে সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন।

**ফা-হিয়েনের বিবরণ :** দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ফা-হিয়েন নামক একজন চীনা ভ্রমণকারী ভারতে আসেন। তিনি পাটলিপুত্র নগরীতে তিন বছর কাটান। সেখানে তিনি সংস্কৃত ও বৌদ্ধশাস্ত্র পড়াশোনা করেন। তিনি ভারতের ওপর একটা বিশদ বিবরণ লিখে গেছেন। তাঁর বিবরণে দেখা যায় যে, রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল সুন্দর সুন্দর দালানে সাজানো। দেশের লোক খুব ধনী ছিল। দেশে কোনোকিছুর অভাব ছিল না। পাটলিপুত্রে অনেকগুলো হাসপাতাল ছিল। এর কোনো-কোনোটায় রোগীদের বিনা খরচে চিকিৎসা করা হত। ফা-হিয়েন মৌর্যসম্রাট অশোকের তৈরি রাজপ্রাসাদও দেখেন। প্রাসাদটি এত সুন্দর ছিল ফা-হিয়েনের মনে হয়েছিল এটি মানুষের তৈরি নয়। পাটলিপুত্রে

একটি বৌদ্ধ বিদ্যালয় ছিল। এখানে দেশী-বিদেশী ছাত্র পড়াশোনা করত। ফা-হিয়েন গুপ্ত শাসন ব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন যে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করত। রাজা ও রাজকর্মচারীগণ প্রজাদের ওপর অত্যাচার করতেন না। অপরাধের জন্য শাস্তির কঠোরতা ছিল না। জরিমানা ছিল সাধারণ অপরাধের শাস্তি। বারবার রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে অপরাধীর ডান হাত কেটে ফেলা হত।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব : দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সাম্রাজ্যকে আরও বিস্তৃত এবং আরও সংহত করেন। তিনি দেশকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করেন। তাঁর আমলে গুপ্ত শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়। তিনি শিল্প-সাহিত্যের উন্নতির জন্য অনেক অর্থ খরচ করতেন। অনেক প্রতিভাবান ও গুণী ব্যক্তি তাঁর দরবারে সমবেত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রধান নয়জনকে ‘নবরত্ন’ বলা হত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভাকবি কালিদাস ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। কিন্তু অন্যান্য ধর্মের প্রতি তাঁর কোনো বিদ্বেষ ছিল না।

### গুপ্ত যুগের কৃতিত্ব

গুপ্ত যুগকে প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ যুগে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে ওঠে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হয়। যুগটি ছিল ধর্মীয় সহিষ্ণুতার যুগ। এই যুগে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পের খুবই উন্নতি হয়।

**রাজনৈতিক ঐক্য :** গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এ সাম্রাজ্যকে আরও বড় করেন। তিনি শকদেরকে পরাজিত করে উপমহাদেশকে বিদেশীদের হাত থেকে মুক্ত করেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর গুপ্ত যুগে উপমহাদেশে পুনরায় রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয়।

**ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি :** গুপ্ত সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব উন্নতি হয়। এ যুগে রোমান সাম্রাজ্য ও চীনের সঙ্গে উপমহাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য চালু ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গেও উপমহাদেশের বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল। ফলে উপমহাদেশ সম্পদশালী হয়ে ওঠে। দেশে প্রাচুর্য ছিল। কোনোকিছুর অভাব ছিল না।

**ধর্মীয় সহিষ্ণুতা :** গুপ্ত যুগে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ছিল। বৈষ্ণবধর্মের পাশাপাশি শৈবধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মও উন্নতি লাভ করে।

**সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প :** গুপ্ত যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের খুব উন্নতি হয়। এ যুগে বহু কবি, দার্শনিক ও নাট্যকারের আবির্ভাব হয়। লেখকগণ শুধু হিন্দু ছিলেন না, তাঁদের কেউ কেউ জৈন এবং বৌদ্ধও ছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত নিজেও একজন কবি ছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভায় কালিদাস, বিশাখ দত্ত, নাগার্জুন, আর্যদেব, সিদ্ধসেন, দিবাকর প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকের সমাবেশ ঘটে। আর্যভট্ট ও বরাহমিহির ছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী। আর্যভট্ট অন্য সবার আগে পৃথিবীর আক্ষিক ও বার্ষিক গতি নির্ণয় করেন। তাঁর গ্রন্থের নাম ‘আর্য সিদ্ধান্ত’। বরাহমিহিরও ছিলেন একজন জ্যোতির্বিদ। তাঁর গ্রন্থের নাম ‘বৃহৎ সংহিতা’। গুপ্ত যুগে উপমহাদেশে সংগীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প ও ধাতব শিল্পের অসামান্য উন্নতি হয়। সমুদ্রগুপ্ত নিজেও একজন সংগীতজ্ঞ ছিলেন। এ যুগে বহু মন্দির ও দেবমূর্তি তৈরি হয়। এ যুগে কতকগুলো বৌদ্ধমূর্তিও তৈরি হয়েছিল। দিল্লির লোহাস্তম্ভ, নালন্দায় পাওয়া বুদ্ধদেবের তামার মূর্তি ও গুপ্ত যুগের অসংখ্য মুদ্রা এ যুগে ধাতবশিল্পের উন্নতির পরিচয় বহন করে। অজন্তা গুহার চিত্রগুলো প্রমাণ করে যে, এ যুগে চিত্রশিল্পের খুবই উন্নতি হয়েছিল। ষষ্ঠ শতকের শুরুর দিকেই উপমহাদেশের বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। দুর্ধর্ষ পাহাড়ি হুণ জাতির আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- মৌর্য বংশ কত বছর স্থায়ী ছিল ?  
ক. খ্রিস্টপূর্ব ৩২৪- ৩০০ অব্দ  
খ. খ্রিস্টপূর্ব ৩০০- ২৫০ অব্দ  
গ. খ্রিস্টপূর্ব ৪২৪- ৪০০ অব্দ  
ঘ. খ্রিস্টপূর্ব ৪০০- ৩৫০ অব্দ
- ধননন্দ পরাজিত হওয়ায় মূল কারণ—  
i. চন্দ্রগুপ্তের রণকৌশল  
ii. বিশাল সৈন্যবাহিনী  
iii. চানক্য ও চন্দ্রগুপ্তের যৌথ প্রচেষ্টা

### নিচের কোনটি সঠিক ?

- |            |                |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii  | খ. ii ও iii    |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

### নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট। প্রজাগণকে তিনি নিজ সন্তানের মতো ভালোবাসতেন। তিনি বলতেন, সকল মানুষই আমার সন্তান। প্রজাদের পার্থিব উন্নতি এবং পরকালের শান্তিই ছিল তাঁর শাসনের লক্ষ্য।

- ওপরের অনুচ্ছেদে কোন শাসককে বুঝানো হয়েছে ?  
ক. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য  
খ. সম্রাট অশোক  
গ. ধননন্দ  
ঘ. চানক্য
- তিনি একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট, কারণ—  
i. প্রজাদের নিজ সন্তানের মতো ভালোবাসতেন  
ii. সকল ধর্মের লোক সমান মর্যাদা পেত বলে  
iii. তাঁর আমলে বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মের মর্যাদা পায়

### নিচের কোনটি সঠিক ?

- |           |             |
|-----------|-------------|
| ক. i      | খ. ii       |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

### ৫. সমুদ্রগুপ্তকে প্রাচীন ভারতের কী বলা হত?

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| ক. শাকরি       | খ. নেপোলিয়ন    |
| গ. আলেকজান্ডার | ঘ. বিক্রমাদিত্য |

### সৃজনশীল প্রশ্ন

ফাহিম তার বন্ধুদের নিয়ে শিক্ষাসফরে অজন্তা গুহা পরিদর্শনে গেল। তারা সেখানে গৌতমবুদ্ধ ও তাঁর কর্মজীবন সম্পর্কে পাথরে খোদাই করা প্রচুর চিত্রকর্ম এবং মৌর্য ও গুপ্ত আমলের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের মূর্তি দেখে সে সময়ের সমৃদ্ধ শিল্পকলা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারল। ফাহিম অনুভব করল যে, শিল্পকর্ম একটি যুগের পরিচয়ও বহন করে।

- অজন্তা গুহার শিল্পকর্মগুলো কোন যুগের ?
- অজন্তার গুহার চিত্রগুলো কী প্রমাণ করে তা ব্যাখ্যা কর।
- এ যুগে বিজ্ঞান ও শিল্পের অগ্রগতি ব্যাখ্যা কর।
- শিল্পকর্মের ভূমিকা সম্পর্কে ফাহিমের অনুভূতির স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

# গুপ্ত-পরবর্তী যুগ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতীয় উপমহাদেশে পুনরায় অরাজকতা দেখা দেয়। উত্তর ভারত অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ সময় হুণ জাতি উত্তর ভারতে প্রাধান্য স্থাপন করে। বেশ কিছুদিন হুণদের প্রাধান্য বজায় থাকে। এ অরাজক অবস্থায় পাঞ্জাবের পূর্বাংশে পুষ্যভূতি বংশ ক্ষমতামালা হয়ে ওঠে।

এ রাজ্যের রাজধানী ছিল থানেশ্বর। প্রভাকরবর্ধন ছিলেন এ বংশের একজন শক্তিশালী রাজা। তিনি হুণদের পরাজিত করে পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল জয় করেন। তিনি রাজপুতনার গুর্জর জাতিকে পরাজিত করে রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন। তিনি কনৌজের রাজা গ্রহবর্ধনের সঙ্গে তার মেয়ে রাজ্যশ্রীর বিয়ে দেন। ৬০৫ সালে প্রভাকরবর্ধন হঠাৎ মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বড়ছেলে রাজ্যবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে বসেন। এ সময় গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক এবং মালবের রাজা দেবগুপ্ত একজোট হয়ে দুইদিক থেকে কনৌজ আক্রমণ করেন। কনৌজরাজ গ্রহবর্ধন আক্রমণকারীদের হাতে নিহত হন এবং রানী রাজ্যশ্রী বন্দি হন। রাজ্যবর্ধন ভগ্নীপতির মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং বোনকে উদ্ধার করার জন্য কনৌজ আক্রমণ করেন। তিনি দেবগুপ্তকে পরাজিত ও নিহত করেন। কিন্তু দেবগুপ্তের মিত্র গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের হাতে তিনি মারা যান। তখন তাঁর ছোটভাই হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে বসেন।

### হর্ষবর্ধন (৬০৬-৬৪৭ সাল)

হর্ষবর্ধন পুষ্যভূতি বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি ৬০৬ সাল থেকে ৬৪৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৪১ বছর রাজত্ব করেন। কনৌজের মন্ত্রীদের অনুরোধে তাঁকে কনৌজের শাসনভারও নিজের হাতে নিতে হয়। ফলে তাঁর রাজ্য আগের চেয়ে অনেক বড় হয়। তিনি রাজধানী থানেশ্বর থেকে কনৌজে নিয়ে আসেন। তখন থেকে কনৌজ উত্তর ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রে পরিণত হয়।

তিনি কামরূপরাজ ভাস্করবর্ধনের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। স্থির হল যে, পশ্চিম ও পূর্ব দিক থেকে গৌড় রাজ্য আক্রমণ করা হবে। হর্ষবর্ধন বোন রাজ্যশ্রীকে বিদ্যুৎ পর্বতের গভীর জঙ্গল থেকে উদ্ধার করেন। শশাঙ্কের বন্দিশালা থেকে মুক্ত হয়ে রাজ্যশ্রী ঐ অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

**হর্ষবর্ধনের রাজ্য জয় :** অতঃপর হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেন। শশাঙ্কের সঙ্গে হর্ষবর্ধনের যুদ্ধের কোনো বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। বানভট্টের ‘হর্ষচরিতে’ এ যুদ্ধের উল্লেখ থাকলেও এর কোনো বিস্তারিত বর্ণনা নেই। মনে হয়, এ যুদ্ধ অনেকদিন স্থায়ী হয়েছিল। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন যে, শশাঙ্ক মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। মনে হয় ৬৩৭ সালের কিছু আগে শশাঙ্ক মারা যান। শশাঙ্ক মারা যাওয়ার পর হর্ষবর্ধন মগধ ও পশ্চিম বাংলা নিজের দখলে নেন। ৬৪৩ সালে হর্ষবর্ধন উড়িষ্যা দখল করেন। সম্ভবত তিনি পশ্চিম ভারতে বলভীর রাজা ধুবসেনকে পরাজিত করেছিলেন। তিনি ধুবসেনের সঙ্গে নিজ কন্যার বিয়ে দিয়ে মৈত্রী স্থাপন করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, তিনি কাশ্মীর ও নেপাল অভিযান করেছিলেন। কিন্তু এ সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না।

উত্তর ভারতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পর হর্ষবর্ধন দক্ষিণ ভারত বিজয়ে বের হন। কিন্তু চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট তিনি পরাজিত হন। ফলে তাঁকে দক্ষিণ ভারত বিজয়ের ইচ্ছা ত্যাগ করতে হয়।

হর্ষবর্ধন এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্য পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মগধ বা বিহার, পশ্চিম বাংলা ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত ছিল। বানভট্ট তাঁকে এজন্যই বলেছেন, ‘পঞ্চভারতের অধিপতি’।

**হর্ষবর্ধনের শাসন ব্যবস্থা :** হর্ষবর্ধন এ বিশাল সাম্রাজ্য সুশাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন। জনগণের মঙ্গলই ছিল তাঁর

শাসনের লক্ষ্য। একটি মন্ত্রিপরিষদের সাহায্যে তিনি শাসনকাজ পরিচালনা করতেন। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে কয়েকটি ‘ভুক্তি’ বা প্রদেশে, প্রত্যেক ভুক্তিকে কয়েকটি ‘বিষয়’ বা জেলায় এবং প্রত্যেক জেলাকে আবার কতকগুলো গ্রামে বিভক্ত করেন। গ্রাম ছিল শাসন ব্যবস্থার সবচেয়ে নিচের স্তর। গ্রামের শাসনভার ‘গ্রামিক’ নামক কর্মচারীর ওপর দেওয়া ছিল। দেশে তিন প্রকারের কর চালু ছিল, যথা—‘ভাগ’, ‘হিরণ্য’ ও ‘বলি’। ভূমিকরকে বলা হত ভাগ। উৎপন্ন শস্যের জন্য ছিল ‘ভাগ’ বা ভূমিকর।

বাণিজ্যের ওপর আরোপিত করকে বলা হত ‘হিরণ্য’। ‘বলি’ ছিল অতিরিক্ত কর। জবুরি অবস্থায় রাষ্ট্রের প্রয়োজনে এ কর আদায় করা হত। বিচারের ক্ষেত্রে উঁচুনিচু ভেদাভেদ ছিল না। অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। গুরুতর অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। তা সত্ত্বেও দেশে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছিল। হিউয়েন সাঙ উল্লেখ করেছেন যে, দস্যুরা তাঁকে কয়েক বার আক্রমণ করেছিল।

**হর্ষবর্ধনের ধর্ম :** হর্ষবর্ধনের পূর্বপুরুষগণ সূর্যের উপাসনা করতেন বলে জানা যায়। হর্ষবর্ধন নিজে প্রথম জীবনে শৈব ধর্মমতের অনুসারী ছিলেন। খুব সম্ভব জীবনের শেষের দিকে তিনি মহাযান বৌদ্ধমতের প্রতি অনুরাগী হয়ে পড়েন। তিনি রাজ্যে জীবহত্যা নিষেধ করে দেন এবং বহু বৌদ্ধমঠ তৈরি করেন। তবে তিনি নিজে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন কিনা তা জানা যায় না। তিনি সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সকল ধর্মের লোকেরা তাঁর কাছে সমান ব্যবহার পেত।

**হর্ষবর্ধনের চরিত্র ও কৃতিত্ব :** হর্ষবর্ধন ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ শাসক। অনেক ঐতিহাসিক তাঁকে প্রাচীন ভারতের ‘শেষ শ্রেষ্ঠ সম্রাট’ বলেছেন। তিনি প্রজাদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন। ‘প্রজার কল্যাণেই রাজার কল্যাণ’—এ নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল। তিনি সারাদিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর কোনো অহংকার ছিল না। মানুষের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত মধুর। প্রজাদের প্রতি তাঁর বিবেচনা প্রশংসা করার মতো।

**হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ :** হিউয়েন সাঙ ছিলেন চীন দেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত। হর্ষবর্ধনের দরবারে তিনি আট বছর কাটান। তিনি তাঁর ভ্রমণ সম্পর্কে লিখেন। তিনি লিখেছেন যে, প্রজাদের অবস্থা নিজের চোখে দেখার উদ্দেশ্যে হর্ষবর্ধন রাজ্য ভ্রমণ করার জন্য বের হতেন। রাজ্যে প্রাণীহত্যা নিষেধ ছিল। অপরাধের জন্য সাজা ছিল খুবই কঠোর। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশে চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল। হিউয়েন সাঙকেও কয়েকবার দেশী দস্যুরা আক্রমণ করেছিল। কনৌজ ছিল দেশের রাজধানী। এটি ছিল অত্যন্ত সুন্দর শহর। হিউয়েন সাঙ উপমহাদেশের প্রাচীন রাজধানী পাটলিপুত্রকে প্রায় ধ্বংসের কাছাকাছি দেখেছিলেন। তিনি ভারতবাসীর সত্যবাদিতার প্রশংসা করেছেন। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে ভারতের সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয় বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি এখানে প্রায় দশ হাজার ছাত্রকে পড়াশোনা করতে দেখেছেন। প্রায় একশো অধ্যাপক ছাত্রগণকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। রাজকোষ থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ চালানো হত। দেশের ধনী লোকেরাও সাহায্য দিতেন। বাংলাদেশের একজন পণ্ডিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর নাম শীলভদ্র। হিউয়েন সাঙ-এর সম্মানে হর্ষবর্ধন কনৌজে একটি ধর্ম সম্মেলন ডেকেছিলেন। এতে কুড়ি জন সামন্ত রাজা, চার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং তিন হাজার জৈন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হাজির হয়েছিলেন। প্রয়াগেও একটি মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। হিউয়েন সাঙ এ মেলারও খুব প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, হর্ষবর্ধন ছিলেন একজন অত্যন্ত দানশীল রাজা।

## উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন

**ইসলামধর্মের উদ্ভব ও মুসলমানদের রাজনৈতিক উত্থান :** ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ইসলামধর্মের উদ্ভব ও মুসলমানদের রাজনৈতিক উত্থানের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা যেতে পারে। ইসলামধর্মের প্রচারক ছিলেন হযরত মুহম্মদ (স)। তিনি আরব দেশের মক্কা নগরীতে ৫৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক গুণাবলির জন্য তিনি ‘আল-আমিন’ বা বিশ্বাসী হিসেবে খ্যাত ছিলেন। ইসলামধর্মের আবির্ভাবের আগে আরবের লোকেরা নানা রকম খারাপ কাজে লিপ্ত ছিল। তারা একাধিক দেব-দেবী, গ্রহ-নক্ষত্র, গাছ, পাথর ইত্যাদির পূজা করত। পবিত্র কাবা ঘরেই তখন ৩৬০টি মূর্তি ছিল। দেশে সুসংবন্দ্য কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল না। সারা দেশ অনেকগুলো গোত্রীয় শাসনের অধীনে ছিল। গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ-বিগ্রহ, খুন-খারাবি ইত্যাদি লেগেই থাকত। এ যুগকে বলা হয় ‘আইয়ামে জাহেলিয়া’ বা অজ্ঞানতা ও অন্ধকারের যুগ।

আরব দেশের এ দুরবস্থা হযরত মুহম্মদ (স)-কে ছোটকাল থেকেই ব্যথিত ও ভাবিত করে। মানুষকে ন্যায়, সত্য ও কল্যাণের পথে কীভাবে ফিরিয়ে আনা যায় সে সম্পর্কে তিনি সবসময় চিন্তা-ভাবনা করতেন। মক্কার অদূরে হেরা পর্বতের গুহায় বসে তিনি প্রায়ই এ ব্যাপারে গভীর ধ্যানে মগ্ন হতেন। যখন তাঁর বয়স ৪০ বছর, তখন হযরত জিবরাইল (আ)-এর মাধ্যমে আল্লাহর তরফ থেকে তিনি প্রথম ‘ওহী’ বা ঐশীবাণী লাভ করেন। এরপর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সময়ে সময়ে ওহী পেয়েছেন। আল্লাহর আদেশে তিনি এ সকল ওহী’র কথা মানুষকে জানাতে শুরু করেন। তিনি প্রচার করেন যে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। হযরত মুহম্মদ (স) তাঁর প্রেরিত রাসূল। অনাচার, অত্যাচার ও মূর্তি উপাসনা বাদ দিয়ে তিনি মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার জন্য আহ্বান জানানেন। যারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঈমান আনলেন এবং ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে সামগ্রিক জীবনচারণে তা গ্রহণ করলেন তারা হলেন মুসলমান। আল্লাহর তরফ থেকে হযরত মুহম্মদ (স)-এর কাছে আসা ওহিগুলো পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে সাজানো হয়। এ মহাগ্রন্থই কুরআন শরীফ। এ ধর্মগ্রন্থে ইসলামের সকল বিধি-বিধান লেখা আছে। আর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিজের বাণী ও আচার-আচরণকে বলা হয় হাদিস।

ইসলামধর্ম আবির্ভাবের প্রাথমিক পর্বে হযরত মুহম্মদ (স) ও তাঁর অনুসারীগণ প্রচণ্ড বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হয়েছেন। তাঁদেরকে নানা রকম অত্যাচার, উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে। কুরাইশসহ অন্যান্য গোত্রের প্রবল বিরোধিতা ও নির্মম অত্যাচারে হযরত মুহম্মদ (স) শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুসারীদের নিয়ে মাতৃভূমি মক্কা থেকে আল্লাহর হুকুমে মদিনায় ‘হিজরত’ করেন। মদিনায় এসে তিনি স্থানীয় সকল গোত্র ও সম্প্রদায়ের সম্মতির ভিত্তিতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হলেন রাষ্ট্রপ্রধান। কিন্তু মক্কার কুরাইশগণ রাসূলুল্লাহ (স)-কে মদিনাতেও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। ইসলামধর্ম ও নতুন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সমুন্নত রাখার জন্য হযরত মুহম্মদ (স) এবং তাঁর অনুসারীদেরকে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে একাধিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর আগে তিনি আরব ভূখণ্ডে ইসলাম ও মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা দেখে যেতে পেরেছেন।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মৃত্যুর পর ‘খুলাফায়ে রাশেদীন’-এর শাসনামলে ইসলামধর্ম ও মুসলিম শাসনের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। বিশেষ করে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (র)-এর শাসনকালে মুসলিম শাসনের খুব প্রসার হয়। এটি একটি বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। তারপর উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে এ সাম্রাজ্য এশিয়া ও আফ্রিকা এবং ইউরোপের কিছু অংশে বিস্তার লাভ করে।

উপমহাদেশের সঙ্গে মুসলমানদের প্রাথমিক যোগাযোগ: বহুকাল পূর্ব থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে আরব বণিকগণের পরিচয় ছিল। মুসলমান বণিকগণও ব্যবসা করার জন্য উপমহাদেশে আসতেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ উপমহাদেশের সমুদ্র-উপকূলে বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করতেন। তাদের নিকট থেকে ভারতীয়গণ ইসলামের কথা জানতে পারে। ইসলামের মূলকথা হল আল্লাহর একত্ব। ইসলাম মানে শান্তি। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। ইসলামের এ সুমহান শিক্ষা স্থানীয় জনগণকে মুগ্ধ করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। এভাবে উপমহাদেশের সঙ্গে মুসলমানদের প্রাথমিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

সিন্ধু বিজয়: উমাইয়া খলিফা আল-ওয়ালিদের শাসনকালে (৭০৫-৭১৫ সাল) মুসলমানগণ প্রথম ভারতের পশ্চিমাঞ্চল জয় করে। আল-ওয়ালিদ ছিলেন একজন খুব বড় বিজেতা। হাজ্জাজ বিন-ইউসুফ ছিলেন তাঁর সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের শাসনকর্তা। এ সময় দাহির ছিলেন সিন্ধুর রাজা। নানা কারণে দাহিরের সঙ্গে হাজ্জাজের সম্পর্ক খারাপ হয়ে পড়ে। হাজ্জাজ সিন্ধু দখল করতে মনস্থ করেন। তিনি সিন্ধু দখল করার জন্য পরপর দুইটি অভিযান পাঠান। কিন্তু এগুলো সফল হয়নি। এরপর ৭১২ সালে তিনি তাঁর জামাতা ও ভাইয়ের ছেলে মুহম্মদ-বিন-কাসিমের অধীনে তৃতীয় অভিযান পাঠান। এ অভিযান সফল হয়। মুহম্মদ-বিন-কাসিম সিন্ধু ও মুলতান মুসলমান শাসনের অধীনে আনেন।

সিন্ধু বিজয়ের ফল: মুসলমানদের সিন্ধু বিজয়ের ফলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উপমহাদেশে ইসলামের প্রভাব বেশ বেড়ে যায়। হিন্দু সমাজে বর্ণবিরোধ ছিল খুব বেশি। বৌদ্ধদের ওপর হিন্দু শাসকগণ খুবই অত্যাচার করত। অন্যদিকে ইসলামে ছিল একতা, সমতা ও ভাই ভাই সম্পর্ক। তাই বৌদ্ধ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুগণ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে।

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযান: মুহম্মদ-বিন-কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের প্রায় তিনশো বছর পর গজনির সুলতান

মাহমুদ ১০০০ সাল থেকে ১০২৭ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে ১৭ বার অভিযান পরিচালনা করেন। এর ফলে ভারতীয় শাসকদের পক্ষে বাইরের আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা অত্যন্ত কমে যায়।

**ভারতে মুসলমান শাসন:** অবশেষে ঘুরের সুলতানের ছোট ভাই এবং গজনীর শাসনকর্তা মুহম্মদ ঘুরী ১১৯২ সালে তরাইনের যুদ্ধে দিল্লি ও আজমিরের রাজা পৃথ্বরাজকে পরাজিত করে দিল্লি ও আজমির দখল করে নেন। মুহম্মদ ঘুরীর প্রতিনিধি কুতুব উদ্দীন আইবেক দিল্লিতে স্থায়ীভাবে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ধীরে ধীরে প্রায় সমস্ত উপমহাদেশ মুসলিম শাসকদের অধীনে চলে আসে। উপমহাদেশে মুসলমান শাসন প্রায় সাতশো বছর স্থায়ী হয়।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হর্ষবর্ধনের শাসনামলে বাগিজের ওপর আরোপিত করকে বলা হয়—  
ক. বলি খ. হিরণ্য  
গ. ভ্যাট ঘ. শুল্ক
২. মুসলমানদের সিন্ধুবিজয়ের ফলে উপমহাদেশে—  
i. ইসলামের প্রভাব বেড়ে যায়  
ii. হিন্দু শাসকদের অত্যাচার বৃদ্ধি পায়  
iii. দলে দলে লোকজন ইসলাম গ্রহণ করে

### নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. ii ও iii  
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩. রাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে আগত বৌদ্ধ পণ্ডিত হিউয়েনসাং-এর বর্ণনা মতে ভারতের অবস্থা সম্পর্কে বলা যায়—  
ক. ভারত একটি নৈরাজ্যপূর্ণ দেশ ছিল খ. ভারতের সমাজ ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন  
গ. ভারতে শিক্ষাদীক্ষার সুন্দর পরিবেশ ছিল ঘ. ভারতের লোকজন অতিথিপরায়ণ ছিল

### সৃজনশীল প্রশ্ন

১. চীনের একজন বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত রাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতে আসেন। তিনি বিভিন্ন এলাকা ভ্রমণ করে দেখেন যে, তখন ভারতে প্রাণীহত্যা নিষিদ্ধ ছিল। অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান ছিল। কিন্তু তবুও বিভিন্ন স্থানে চোর-ডাকাতে প্রভাব ছিল। এমনকি তিনি নিজেও কয়েকবার আক্রান্ত হন। তবে তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষার অবস্থা দেখে মুগ্ধ হন।  
ক. অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিখ্যাত পণ্ডিতের নাম কী ছিল?  
খ. উক্ত পণ্ডিত ভারতের বিভিন্ন রাজ্য কেন ভ্রমণ করেন?  
গ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত পণ্ডিতের বর্ণনানুযায়ী শিক্ষার প্রসারে হর্ষবর্ধনের কী অবদান রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।  
ঘ. তোমার মতে উক্ত পণ্ডিত হর্ষবর্ধনের শাসন ব্যবস্থায় কেন মুগ্ধ হয়েছিলেন?
২. ইসলাম ধর্মের প্রচারক হযরত মুহম্মদ (স) যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন আরবের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। সমাজে নারীর কোনো মর্যাদা ছিল না। কন্যাশিশুকে জীবন্ত কবর দেওয়া হত। হযরত মুহম্মদ (স) ইসলামের শান্তির বাণী প্রচার করেন। আর এই বাণী দেশ থেকে দেশান্তরে পৌঁছায়। কালের অমোঘ নিয়মে এই বাণী উপমহাদেশেও বিস্তার লাভ করে।  
ক. হযরত মুহম্মদ (স) কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?  
খ. বর্ণিত যুগকে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।  
গ. নারীর মর্যাদা রক্ষায় ইসলামের বাণী কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? ব্যাখ্যা কর।  
ঘ. উপমহাদেশে ইসলামের বিস্তারের ফলাফল মূল্যায়ন কর।

# চতুর্থ অধ্যায়

## প্রাচীন যুগে বাংলাদেশ

### প্রথম পরিচ্ছেদ

### আদি মানবসংস্কৃতি-প্রাচীন জনপদ

### আর্যদের আগমন

#### আদি মানব-সংস্কৃতি

বাংলাদেশে কখন মানুষের বসবাস শুরু হয়েছে, তা সঠিকভাবে জানা যায় না। বাংলাদেশের সকল অঞ্চলের ভূমি একই রকম পুরোনো নয়। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার মাটি অপেক্ষাকৃত নতুন। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, বাংলায়ও মানব সভ্যতার বিবর্তন ঘটেছে। এখানেও মানুষ পুরাতন পাথরের যুগ, নতুন পাথরের যুগ এবং তামার যুগ পার হয়ে এসেছে। পঁচিশ হাজার বছর থেকে দশ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত সময়কালকে বলা হয় পুরাতন পাথরের যুগ। তারপর যথাক্রমে আসে নতুন পাথরের যুগ ও তামার যুগ। লোহার আবিষ্কার হয় আরও পরে। সাধারণত ধারণা করা হয় যে, খ্রিস্টের জন্মের দেড় হাজার বছর আগে মানুষ লোহা ব্যবহার করতে শিখে। পাথরযুগের হাতিয়ারের নিদর্শন পাওয়া গেছে কুমিল্লার লালমাই, চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে। সুতরাং এ থেকে অনুমান করা যায় যে, দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা বাদে বাংলার বাকি অঞ্চলে অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ বাস করে আসছে।

বাংলার সবচেয়ে পুরোনো সভ্যতা : কিছুদিন আগে পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলায় অজয় নদের দক্ষিণতীরে ‘পাডুরাজার টিবি’ নামক জায়গায় মাটি খুঁড়ে একটি পুরোনো সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। পণ্ডিতদের ধারণা, এ সভ্যতা প্রাচীনত্বের দিক থেকে সিন্ধুসভ্যতার কাছাকাছি। অজয় নদের সভ্যতা বাংলার সবচেয়ে পুরোনো সভ্যতা।

তাম্র প্রস্তর যুগ : আর্যদের বাংলায় আসার আগে এবং অজয় নদের সভ্যতার কিছু পরে বাংলায় নিষাদ, পুন্ড্র ও বঙ্গা জাতি একটা উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল। এ সময় বাংলার অধিবাসীগণ কৃষিকাজ করত। তারা ধান ও আখের চাষ করত। নদীনালায় দেশ বলে বাংলায় প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। স্বভাবতই মাছ-ভাত ছিল বাঙালির প্রধান খাদ্য। আখের রস জ্বাল দিয়ে তারা গুড় ও চিনি তৈরি করত। তারা তুলা চাষ করত এবং কাপড় বুনতে জানত। তারা নৌকা তৈরি করতে পারত। অনেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য করত। প্রকৃতি পূজার সঙ্গে সঙ্গে তারা কালীপূজা, শিবের গাজন, মনসা পূজা ইত্যাদিও পালন করত। নতুন ফসল তোলার সময় তারা নানা অনুষ্ঠান পালন করত।

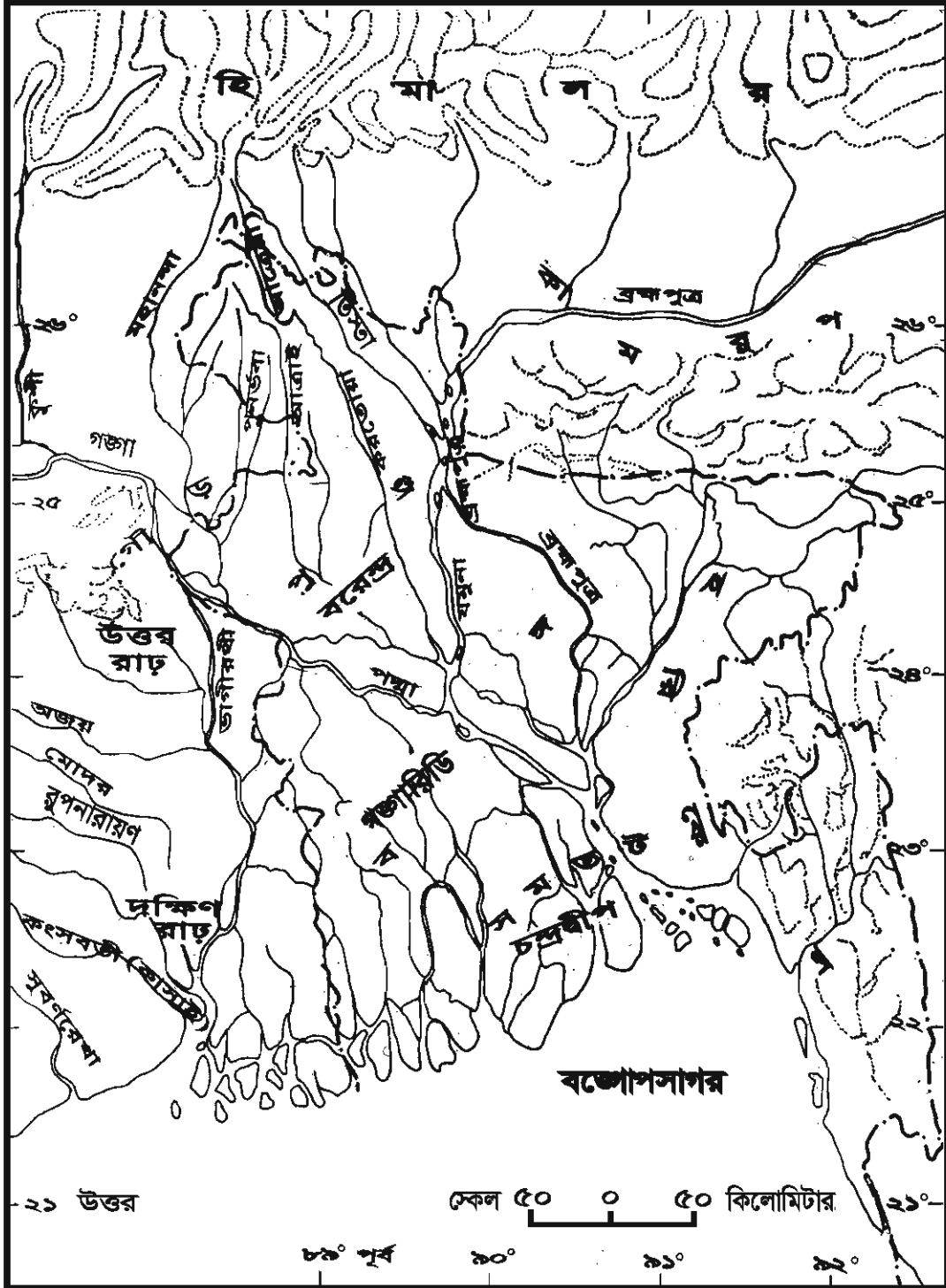
আর্যদের বাংলায় আসার আগেও এখানকার মানুষের বীরত্বের কথা জানা যায়। গ্রিক লেখকদের বর্ণনা মতে, ৩২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডারের উত্তর-পশ্চিম ভারত আক্রমণকালে প্রাচীন বাংলায় ‘গঙ্গারিডই’ নামে একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল। আধুনিক পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, এটি গঙ্গা নদীর তীরে কোনো এক অঞ্চলে অবস্থিত ছিল।

#### প্রাচীন বাংলাদেশের জনপদসমূহ

বাংলাদেশ বলতে আমরা আমাদের বর্তমান বাংলাদেশকে বুঝে থাকি। প্রাচীনকালে বাংলাদেশে একক কোনো রাষ্ট্র ছিল না। এটি ছিল তখন কতকগুলো ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত। এক একটি অঞ্চল এক একটি জনপদ নামে পরিচিত ছিল। ভিন্ন ভিন্ন রাজা ভিন্ন ভিন্ন জনপদ শাসন করতেন। তখনও কোনো রাজনৈতিক ঐক্য সাধিত হয়নি। প্রায়ই বিভিন্ন জনপদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হত। এর ফলে জনপদগুলোর সীমা পরিবর্তিত হত—কোনোটর সীমা বাড়ত, আবার কোনোটর সীমা কমত। আমরা পুন্ড্র, বরেন্দ্র, বঙ্গা, সমতট, হরিকেল, গৌড় প্রভৃতি কয়েকটি জনপদের কথা জানতে পারি। এ সকল জনপদের অবস্থান নির্দিষ্ট করা বেশ কঠিন।



পুন্ড্র: প্রাচীন বাংলার অন্যতম জনপদ ছিল পুন্ড্র। বর্তমানে বৃহত্তর বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর নিয়ে গঠিত ছিল প্রাচীন পুন্ড্র জনপদ। পুন্ড্র জাতি এ অঞ্চলে বাস করত বলে এর এরূপ নাম হয়েছিল। পুন্ড্রনগর ছিল এ জনপদের রাজধানী। বগুড়া শহরের অদূরবর্তী মহাস্থানগড়ই প্রাচীন পুন্ড্রনগর বলে চিহ্নিত হয়েছে। এখানেই একটা পাথরের চাকতিতে বাংলার প্রাচীনতম লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি একটি ব্রাহ্মী লিপি। এ লিপিতে সম্রাট অশোক পুন্ড্রনগরের শাসনকর্তাকে দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণকে সেবা করার নির্দেশ দিচ্ছেন।



চিত্র ৪.১ : প্রাচীন বাংলাদেশের জনপদসমূহ

**বরেন্দ্র :** বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী নামক আর একটা জনপদের উল্লেখ আমরা পাই। কিন্তু পণ্ডিতদের ধারণা বরেন্দ্র নামে স্বতন্ত্র কোনো জনপদ ছিল না। বরেন্দ্র ছিল পুন্ড্র জনপদেরই অংশবিশেষ। বর্তমানেও রাজশাহী ও বগুড়ার অংশবিশেষকে বরেন্দ্র অঞ্চল বলে চিহ্নিত করা হয়।

**বঙ্গ :** আমাদের বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল প্রাচীন বঙ্গ জনপদ। অনুমান করা হয়, বঙ্গ নামক একটা জাতি এ জনপদে বাস করত। বৃহত্তর ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালি জেলা নিয়ে বঙ্গ জনপদ গঠিত ছিল। বঙ্গরাজ ও বঙ্গসেনাদের খুব খ্যাতি ছিল।

**সমতট :** বঙ্গের পাশের অঞ্চলটি সমতট নামে পরিচিত ছিল। গঙ্গার শাখা ভাগীরথীর পূর্বতীর থেকে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ সমতট নামে পরিচিত ছিল। অনেকের ধারণা, কুমিল্লা জেলার বড় কামতা ছিল এ জনপদের অন্তর্ভুক্ত।

**হরিকেল :** কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, বর্তমান সিলেট ও চট্টগ্রাম নিয়ে গঠিত ছিল প্রাচীন হরিকেল জনপদ। তবে হরিকেল আদৌ কোনো স্বতন্ত্র জনপদ ছিল কিনা সে বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত নন। কেউ কেউ মনে করেন, হরিকেল ছিল বঙ্গেরই অংশ।

**গৌড় :** প্রাচীনকালে উত্তর বাংলাদেশে গৌড় রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন এর সীমা যে কী ছিল, তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে ষষ্ঠ শতকে ভারতীয় বাংলা প্রদেশের (পশ্চিম বাংলা) মধ্যাঞ্চলে গৌড় নামক একটা রাজ্য গড়ে উঠেছিল বলে জানা যায়। মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলার বিজিত অঞ্চলগুলো নিয়ে গড়ে ওঠে লখনৌতি প্রদেশ এবং এর রাজধানী শহরের নাম হয় গৌড় বা লখনৌতি। সপ্তম শতকে শশাঙ্ক ছিলেন এ রাজ্যের রাজা। সুতরাং প্রাচীনকালে এ অঞ্চলেই গৌড় জনপদটি গড়ে উঠেছিল। শশাঙ্কের আমলে কর্ণসুবর্ণ ছিল গৌড় রাজ্যের রাজধানী। এটি ছিল বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায়। মুসলমান বিজয়ের কিছু আগে মালদহ জেলার লক্ষণাবতীকেও গৌড় বলা হত। সেন আমলে সারা বাংলার রাজাকে বলা হত গৌড়েশ্বর। আধুনিক মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমানের অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত ছিল প্রাচীন গৌড় নামক জনপদ।

**রাঢ় :** প্রসঙ্গাত উল্লেখ্য যে, ভারতীয় বাংলা প্রদেশের (পশ্চিম বাংলা) দক্ষিণাংশ রাঢ় নামে পরিচিত ছিল। অজয় নদ দ্বারা রাঢ় দুইভাগে বিভক্ত ছিল, যথা—অজয়ের উত্তরে উত্তর রাঢ় এবং দক্ষিণে দক্ষিণ রাঢ়।

#### আর্যদের আগমন :

সম্ভবত খ্রিস্টীয় প্রথম শতক বা তার কিছু আগে আর্যরা বাংলায় আসতে শুরু করে। বাংলায় তাদের আগমনের কারণ ছিল একাধিক। তবে এখানকার মানুষের আয়ত্রে দীর্ঘকাল ধরে ইচ্ছাটাই ছিল সবচেয়ে বড়। এখানে আসার পর তারা স্থানীয় জনগণের ওপর তাদের প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। আবার তারাও স্থানীয় অধিবাসীদের আচার-আচরণের বিভিন্ন দিক নিজেদের জীবনে গ্রহণ করে। তবে ধীরে ধীরে স্থানীয় অধিবাসীরাই আর্য-সংস্কৃতিতে প্রভাবিত হয়ে ওঠে।

জনপদগুলো প্রাচীন ভারতের শক্তিশালী মৌর্য ও গুপ্তদের সাম্রাজ্য বিস্তারের পূর্বপর্যন্ত নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখে। এরপরে বাংলার রাজনীতিতে অনেক পালাবদল ঘটে। অবশেষে মধ্যযুগের প্রথম পর্বে পুরো বাংলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন সময়কালকে পুরাতন পাথরের যুগ বলা হয়?
  - ক. ৩০ হাজার থেকে দশ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত
  - খ. ২৫ হাজার থেকে দশ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত
  - গ. ২০ হাজার থেকে ছয় হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত
  - ঘ. ১৫ হাজার থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত
২. বাংলার আদি মানব-সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রযোজ্য উক্তিসমূহ—
  - i. অতি প্রাচীনকাল থেকে এখানে মানুষ বাস করে আসছে
  - ii. নতুন পাথরের যুগ ও তামার যুগ
  - iii. পুরাতন পাথরের যুগ, নতুন পাথরের যুগ, তামার যুগ

### নিচের কোনটি সঠিক?

- |            |                |
|------------|----------------|
| ক. i       | খ. i ও ii      |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের চিত্রটি দেখে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

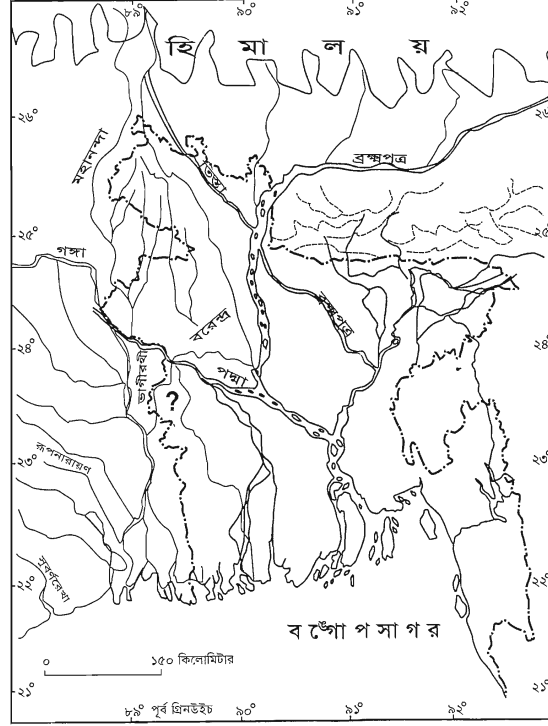


৩. উপরের চিত্রে উল্লিখিত শব্দগুলো কিসের নাম?
 

ক. দেশের	খ. রাজ্যের
গ. সাম্রাজ্যের	ঘ. জনপদের
৪. পুণ্ড্রের রাজধানীর নাম কী?
 

ক. কর্ণসুবর্ণ	খ. পুণ্ড্রবর্ধন
গ. ঢাকা	ঘ. উড়িষ্যা

### সৃজনশীল প্রশ্ন



মানচিত্রটি ব্যবহার করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

- ক. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে পাথর-যুগের হাতিয়ারের নিদর্শন পাওয়া গেছে?
- খ. বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদসমূহের যে-কোনো একটির বর্ণনা দাও।
- গ. প্রদত্ত মানচিত্রে প্রশ্নবোধক (?) স্থানসমূহে কোন কোন প্রাচীন জনপদের অবস্থান ছিল এর একটি তালিকা প্রস্তুত করে দেখাও।
- ঘ. প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা থেকে ভিন্নতর ছিল- মতামত দাও।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# বাংলায় মৌর্য ও গুপ্ত শাসন

**বাংলায় মৌর্য শাসন:** সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে (২৬৯-২৩২ খ্রিস্টপূর্ব) উত্তর বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মৌর্য শাসনের অধীনে অঞ্চলটি একটি প্রদেশের মর্যাদা পায়। মৌর্য শাসনাধীন বাংলার রাজধানী ছিল পুন্ড্রনগর। মহাস্থানগড়ে মৌর্য সম্রাট অশোকের একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। এ শিলালিপিতে সম্রাট পুন্ড্রনগরের শাসনকর্তাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন দুর্ভিক্ষের সময় জনগণকে অর্থ ও শস্য দিয়ে সাহায্য করেন। মৌর্য আমলে পুন্ড্র অঞ্চলে বেশ বড় ধরনের দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। প্রজাদের দুঃখকষ্টের প্রতি শাসকগণ যে উদাসীন ছিলেন না, লিপিটি থেকে সেরকম ধারণা পাওয়া যায়।

**বাংলায় গুপ্ত শাসন:** ভারতে গুপ্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ৩২০ সালে। গুপ্ত সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের আমলেই পুন্ড্রের কিছু অংশ গুপ্ত শাসনের অধীনে চলে যায়। সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন একজন বড় বিজেতা। তাঁর আমলে সমতট ছাড়া বাংলার আর সকল জনপদ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। গুপ্ত অধিকৃত বাংলার রাজধানীও ছিল পুন্ড্রনগর। ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলায় গুপ্ত শাসন টিকে ছিল। এ সময় বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা ভালো ছিল। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। বিভিন্ন পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। গুপ্ত রাজাগণ হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এজন্য এ যুগে হিন্দুধর্মের খুব উন্নতি হয়। তবে এ সময় বৌদ্ধদের ওপর অত্যাচার করা হত না।

**মহাস্থানগড় (পুন্ড্রনগর):** বগুড়া শহরের অদূরবর্তী মহাস্থানগড়কে প্রাচীন পুন্ড্রনগর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। একসময় পুন্ড্রনগর ছিল পুন্ড্র জনপদের রাজধানী। মৌর্য ও গুপ্ত যুগেও পুন্ড্রনগরই ছিল মৌর্য ও গুপ্ত অধিকৃত বাংলার রাজধানী। তখন এটি একটি সমৃদ্ধ শহর ছিল। করতোয়া নদী এর পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল। করতোয়া তখন একটি বিশাল নদী ছিল। পুন্ড্রনগর ছিল শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র। দূর-দূরান্ত থেকে শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থী ও পণ্ডিতগণ এবং ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীগণ পুন্ড্রনগরে আসতেন।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# গৌড়রাজ শশাঙ্ক ও শশাঙ্ক-পরবর্তী যুগ

### স্বাধীন গৌড়রাজ শশাঙ্ক

পরবর্তী গুপ্ত রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে গৌড় রাজ্যের স্বাধীন রাজা হন শশাঙ্ক। তাঁর বংশ পরিচয় আমাদের সঠিক জানা নেই। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন গুপ্ত বংশের রাজা মহাসেন গুপ্তের একজন সামন্ত রাজা। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনি মহাসেন গুপ্তের পুত্র ছিলেন। ৬০৬ সালের কিছু আগে তিনি গৌড়ের রাজা হন। তাঁর রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণে।

মালবের দেবগুপ্ত, থানেশ্বরের রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধন, কনৌজের গ্রহবর্মণ এবং কামরূপের ভাস্করবর্মণ ছিলেন উত্তর ভারতে তাঁর সময়কার কয়েক জন রাজা।

রাজ্য জয়: শশাঙ্ক বাংলার অন্যান্য জনপদ দখল করে বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তিনি উৎকল (উড়িষ্যা), কজ্জাদ, মগধ ইত্যাদি দখল করেন। এ সময় থানেশ্বর, কনৌজ ও কামরূপের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। শশাঙ্ক তাই মালবের রাজা দেবগুপ্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। দেবগুপ্তের হাতে গ্রহবর্মণ নিহত হন। কনৌজের রানী রাজ্যশ্রী বন্দি হন।

হর্ষবর্ধনের সঙ্গে যুদ্ধ: রাজ্যশ্রী ছিলেন থানেশ্বরের রাজকন্যা। গ্রহবর্মণের মৃত্যুর পর দেবগুপ্ত থানেশ্বরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধনের কাছে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। এরপর শশাঙ্কের সঙ্গে রাজ্যবর্ধনের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রাজ্যবর্ধন পরাজিত ও নিহত হন। তখন থানেশ্বরের সিংহাসনে বসেন রাজ্যবর্ধনের ছোটভাই হর্ষবর্ধন। কনৌজের অমাত্যদের অনুরোধে হর্ষবর্ধনকে কনৌজ শাসনের দায়িত্বও নিতে হয়। হর্ষবর্ধন ভাইয়ের হত্যাকারী শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এ যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে আমরা তেমন কিছু জানি না। বাণভট্টের ‘হর্ষচরিতে’ এবং হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণে এ যুদ্ধ সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য নেই। তবে মনে হয় এ যুদ্ধ দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল। অন্তত ৬১৯ সাল পর্যন্ত যে শশাঙ্ক ক্ষমতামালা ছিলেন সে প্রমাণ পাওয়া যায়। হিউয়েন সাঙ বলেন, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত শশাঙ্ক গৌড়ের সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন। খুব সম্ভব ৬৩৭ সালের কিছু আগে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়।

শশাঙ্কের চরিত্র ও কৃতিত্ব: শশাঙ্ক ছিলেন একজন শক্তিশালী শাসক। তিনি বাংলার গৌরব বাড়িয়েছিলেন। তাঁর শাসনামলেই বাংলা সর্বপ্রথম উত্তরভারতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নেয়। দুঃখের বিষয় তাঁর সম্পর্কে আমরা তেমন কিছু জানি না। তাঁর সম্পর্কে জানার একমাত্র সূত্র হল তাঁর শত্রুপক্ষের বিবরণ। ধারণা করা যায়, তিনি প্রজাদের ভালোবাসতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্য শত্রুগণ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। হর্ষবর্ধনের ভাগে পড়ে তাঁর রাজ্যের পশ্চিমাংশ এবং ভাস্করবর্মণের ভাগে পড়ে তাঁর রাজ্যের পূর্বাংশ।

শশাঙ্ক-পরবর্তী যুগের অরাজকতা: শশাঙ্ক-পরবর্তী একশো বছরেরও বেশি সময়ের ইতিহাস ছিল অরাজকতার ইতিহাস। এ সময়কালের প্রথমদিকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর শাসনে ছিল। পরে এখানে ছোট ছোট রাজ্যের জন্ম হয়। কেন্দ্রীয় কোনো শক্তি ছিল না। বিশ্জালা, লুটরাজ, দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার ইত্যাদি অনাচারে দেশ ভরে গিয়েছিল। পাল তাম্রশাসনে (তামার পাতে লেখা লিপিতে) এ অবস্থাকে বলা হয়েছে ‘মাৎস্যন্যায়’। মাৎস্যন্যায় কথা দ্বারা এমন অবস্থাকে বোঝানো হয়, যেখানে কোনো আইন-শৃঙ্খলা থাকে না। বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে গিলে ফেলে তেমনি সবল দুর্বলের ওপর অত্যাচার চালালে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকেই এককথায় ‘মাৎস্যন্যায়’ বলে বোঝানো হয়। মোটকথা শশাঙ্ক-পরবর্তী যুগে বাংলাদেশে খুবই দুর্দিন নেমে আসে।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. প্রাচীন যুগে উত্তর বাংলা প্রদেশের মর্যাদা পায় কোন শাসনামলে?
 

ক. অশোক	খ. সমুদ্রগুপ্ত
গ. শশাঙ্ক	ঘ. হর্ষবর্ধন
২. মৌর্য শাসনধীনে বাংলার রাজধানী কোথায় ছিল?
 

ক. বরেন্দ্র	খ. সমতট
গ. পুণ্ড্র	ঘ. গৌড়
৩. ‘মাৎস্যন্যায়’ বলতে বুঝায়—
  - i. মাছ ধরার নিয়মনীতি
  - ii. দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার
  - iii. রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ও লুটতরাজ

### নিচের কোনটি সঠিক?

- |            |                |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii  | খ. ii ও iii    |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |
৪. শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধনের যুদ্ধের কারণ—
    - i. হর্ষবর্ধনের ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ
    - ii. শশাঙ্কের ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ
    - iii. শশাঙ্কের সঙ্গে দেবগুপ্তের বন্ধুত্ব

### নিচের কোনটি সঠিক?

- |        |           |
|--------|-----------|
| ক. i   | খ. ii     |
| গ. iii | ঘ. i ও ii |

### সৃজনশীল প্রশ্ন

আলী হাসান ও তার সহপাঠীরা সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষকের নেতৃত্বে শিক্ষাসফরে মহাস্থানগড় পরিদর্শন করে। মহাস্থানগড়ে মৌর্যশাসন আমলে সম্রাট অশোকের একটি শিলালিপি ও কিছু প্রাচীন নিদর্শন দেখতে পায়। এই শিলালিপিটি তার কাছে ব্যতিক্রম বলে মনে হয়। সে আরও জানতে পারে মহাস্থানগড় ছিল শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র।

- ক. মৌর্য শাসন আমলে বাংলার রাজধানী কোথায় ছিল?
- খ. মহাস্থানগড়ের অবস্থান ব্যাখ্যা কর।
- গ. হাসানের কাছে অশোকের শিলালিপিটি ব্যতিক্রম বলে মনে হচ্ছে কেন? বর্ণনা কর।
- ঘ. “মহাস্থানগড় ছিল শিক্ষা সংস্কৃতি ও ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র”—বিষয়টি বুঝিয়ে লেখো।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

# বাংলায় পাল শাসন : গোপাল-ধর্মপাল-দেবপাল- প্রথম মহীপাল ও রামপাল

### গোপাল : পাল শাসনের প্রতিষ্ঠাতা

#### পাল বংশের উদ্ভব

পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম গোপাল। প্রাপ্ত বিভিন্ন উপাদানে গোপাল কর্তৃক বাংলার সিংহাসনারোহণের প্রকৃতি স্পষ্ট নয়। ধারণা করা হয়, ‘মাৎস্যন্যায়’ অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাংলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ নিজেদের মধ্য থেকে এক জনকে রাজা মনোনীত করে। এ নির্বাচিত রাজার নাম গোপাল। সম্ভবত তিনি ছিলেন একজন বড় সামন্ত। তিনি বিশেষ কয়েক জন সামন্তের সাহায্য পান এবং তাদের সহযোগিতায় অন্যান্যকে পরাজিত করে রাজা হন। গোপাল আনুমানিক ৭৫৬ সালে রাজা হন। তাঁর শাসনে অল্পদিনের মধ্যেই দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে। তিনি দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ছাড়া আর প্রায় সমস্ত বাংলাকে নিজের অধীনে আনেন। তিনি আনুমানিক ৭৮১ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর পুত্র ধর্মপালকে উত্তরাধিকারী করে যান। এভাবে গোপাল একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। গোপাল প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম পাল বংশ। এ বংশ বাংলা ও বিহারে প্রায় ৪০০ বছর রাজত্ব করে।

#### ধর্মপাল (৭৮১-৮২১ সাল)

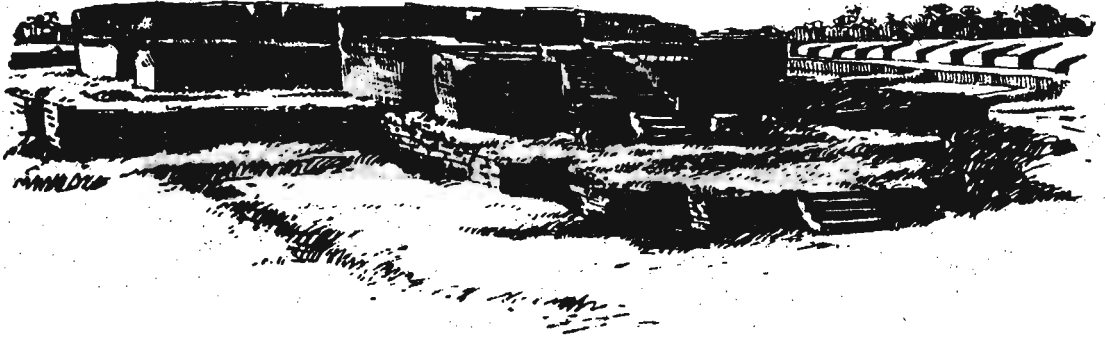
ধর্মপাল ৭৮১ সাল থেকে ৮২১ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪০ বছর রাজত্ব করেন। পাল রাজাদের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তিনি মগধ বা বিহার জয় করেন এবং পাটলিপুত্রে (পাটনা) রাজধানী স্থাপন করেন। বাংলাকে উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করার কৃতিত্ব তাঁর। এজন্য তাঁকে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির সঙ্গে পরপর দুইবার যুদ্ধ করতে হয়। ধর্মপালকে এ যুদ্ধগুলো করতে হয়েছিল রাজপুতনার গুর্জর-প্রতীহার বংশের বিরুদ্ধে এবং দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট বংশের বিরুদ্ধে। তিন পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল বলে যুদ্ধগুলোকে ‘ত্রিপক্ষীয় যুদ্ধ’ বলা হয়।

**ত্রিপক্ষীয় যুদ্ধের প্রথম পর্যায়:** কনৌজের অধিকার নিয়ে ধর্মপালের সঙ্গে গুর্জর-প্রতীহার বংশীয় বৎসরাজের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ধর্মপাল পরাজিত হন। কিন্তু ঠিক এসময় দক্ষিণ ভারত থেকে রাষ্ট্রকূট রাজা ধ্রুবধারাবর্ষ উত্তর ভারত অভিযান করেন। তিনি বৎসরাজকে পরাজিত করেন। ধর্মপালও ধ্রুবর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন। কিন্তু ধ্রুব বেশিদিন উত্তর ভারতে থাকতে পারেননি। শীঘ্রই তাঁকে নিজ দেশে ফিরতে হয়। ফলে লাভ হল ধর্মপালের। তিনি তাঁর মনোনীত চক্রাযুধকে কনৌজের সিংহাসনে বসান। অনেক রাজাই এ ব্যাপারে তাঁকে সমর্থন দেন। সুতরাং উত্তর ভারতে বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

**ত্রিপক্ষীয় যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়:** প্রথম ত্রিপক্ষীয় যুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েক বছর পর গুর্জর-প্রতীহার বংশের সঙ্গে ধর্মপালের আবার যুদ্ধ বাধে। এবার গুর্জর-প্রতীহারদের নেতা ছিলেন বৎসরাজের ছেলে দ্বিতীয় নাগভট্ট। যুদ্ধে ধর্মপাল পরাজিত হন। কিন্তু নাগভট্ট ক্ষমতা সুসংহত করার আগেই রাষ্ট্রকূট রাজার আগমন ঘটে। এসময় রাষ্ট্রকূট রাজা ছিলেন তৃতীয় গোবিন্দ। তৃতীয় গোবিন্দের নিকট নাগভট্ট পরাজিত হন। ধর্মপালও গোবিন্দের নিকট নতি স্বীকার করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই গোবিন্দকে দেশে ফিরে যেতে হয়। সুতরাং সবচেয়ে বেশি লাভবান হন ধর্মপাল। তিনি বাকি জীবন শান্তিতে রাজত্ব করেন।

**ধর্মপালের চরিত্র ও কৃতিত্ব:** ধর্মপাল সুশাসক ছিলেন। তিনি দক্ষ কূটনীতিবিদ ছিলেন। বাংলাকে তিনি উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেন। ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন। নিজে বৌদ্ধ হলেও অন্য ধর্মের প্রতি তিনি উদার ছিলেন। তাঁর একজন হিন্দু মন্ত্রী ছিলেন।



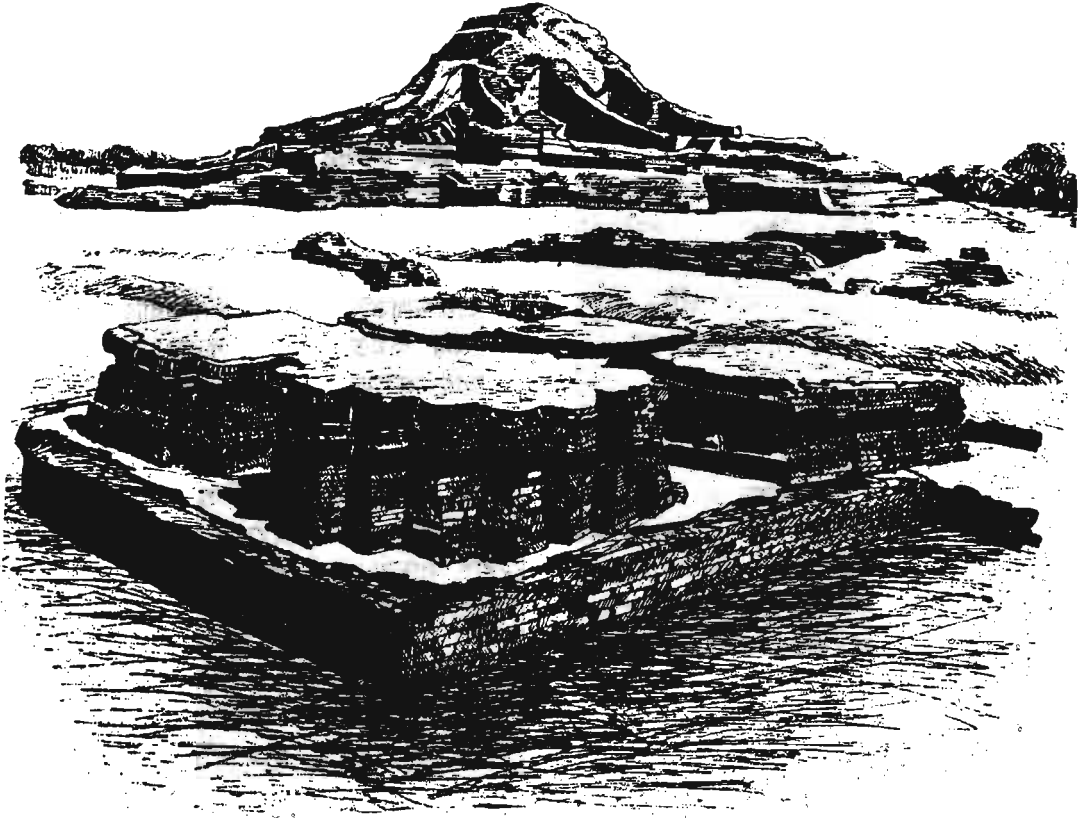


চিত্র ৪.২ : মূল মন্দির, শালবন বিহার, ময়নামতি

ধর্মপাল বিদ্যা ও বিদ্বানের সমাদর করতেন। তিনি বৃহত্তর রাজশাহী জেলার (বর্তমান নওগাঁ জেলার) পাহাড়পুরে একটি বিহার বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বিহারটির নাম ছিল সোমপুর বিহার। এটি সে সময়ে উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। ভাগলপুরের কয়েক কিলোমিটার পূর্বদিকে তিনি আর একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মপালের অপর নাম ছিল বিক্রমশীল। তাঁর এই নামানুসারে বিহারটির নাম হয় বিক্রমশীল বিহার।

#### দেবপাল (৮২১-৮৬১ সাল)

ধর্মপালের পর দেবপাল পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন ধর্মপাল ও দেবদেবীর পুত্র। তিনি ৮২১ সাল থেকে ৮৬১ সাল পর্যন্ত ৪০ বছর রাজত্ব করেন। তিনিও পিতার মতো সক্ষম ও সফল শাসক ছিলেন। তাঁর সময় পাল সাম্রাজ্যের আরও বিস্তার ঘটে। তাঁর পিতৃব্যপুত্র জয়পাল ছিলেন তাঁর প্রধান সেনাপতি। তিনি অত্যন্ত বীর ছিলেন।



চিত্র ৪.৩ : পাহাড়পুর বিহারের (সোমপুর বিহার) কেন্দ্রীয় মন্দির, নওগাঁ

তিনি দেবপালের প্রতি অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় পাল সাম্রাজ্য দক্ষিণে উড়িষ্যা এবং উত্তর-পূর্বে কামরূপ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। রাস্ট্রকূট ও প্রতীহার রাজাদের সঙ্গেও দেবপালকে যুদ্ধ করতে হয়। তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেন মন্ত্রী দর্ভপানি ও কেদারমিশ্র। মোটকথা, দেবপালের সময় পাল-সাম্রাজ্যের গৌরব উত্তর ভারতের সকল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

দেবপাল পিতা ও পিতামহের মতো বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন। নিজে বৌদ্ধধর্মের অনুসারী হলেও অন্য ধর্মের অনুসারীদের বিরুদ্ধে তিনি কোনো প্রকার অত্যাচার করেননি। তাঁর মন্ত্রী কেদারমিশ্র ছিলেন একজন উচ্চবর্ণের হিন্দু। দেবপালের রাজত্বকালেও শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারা বজায় ছিল।

গোপাল, ধর্মপাল এবং দেবপাল মিলে প্রায় একশো বছর রাজত্ব করেন। তারপর পাল সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব চলে যায় দেবপালের পিতৃব্য বাকপালের বংশধরদের হাতে। ঐতিহাসিকগণ দেবপালের সময় পর্যন্ত পাল শাসনামলকে ‘উদীয়মান প্রতিপত্তির যুগ’ আখ্যা দিয়েছেন। পাল বংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শাসনামলে পালশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

### প্রথম মহীপাল (৯৯৫-১০৪৩ সাল)

প্রথম মহীপাল ছিলেন পাল বংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ের একজন শক্তিশালী রাজা। এ দ্বিতীয় অধ্যায়ের শাসনামলে গৌরব হারাতে হারাতে পালশক্তি যখন একেবারেই দুর্বল, তখন মহীপাল বাংলার সিংহাসনে বসেন। মহীপালের পক্ষে পালদের পূর্বগৌরব ফিরিয়ে আনা সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু তিনি পাল সাম্রাজ্যকে আসন্ন পতনের হাত থেকে রক্ষা করেন। শত্রুগণ উত্তর বাংলা ও পশ্চিম বাংলা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু মহীপাল তাদের পরাজিত করেন।

মহীপাল জনদরদী শাসক ছিলেন। তিনি প্রজাদের সুবিধার জন্য বহুস্থানে বড় বড় দিঘি খনন করেন। বহু সুকীর্তির সঙ্গে মহীপালের নাম জড়িত রয়েছে, যেমন- ‘মহীপাল দীঘি’, ‘মহীসন্তোষ’, ‘মহীপালের গীত’ ইত্যাদি। তিনি ৯৯৫ সাল থেকে ১০৪৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪৮ বছর রাজত্ব করেন।

### রামপাল (১০৮২-১১২৪ সাল)

প্রথম মহীপালের মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন আর কোনো যোগ্য শাসক পাল-সিংহাসনে বসেননি। এ সময় দক্ষিণ ভারতের কলচুরি ও কর্ণাটের চালুক্য রাজারা বারবার বাংলা আক্রমণ করতে থাকেন। ফলে পাল সাম্রাজ্য দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় মহীপালের সময় বরেন্দ্রে কৈবর্ত বিদ্রোহ হয়। এ বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন দিব্য। দিব্য বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে দ্বিতীয় মহীপাল নিহত হন। এরপর তাঁর ছোটভাই শূরপাল অল্পদিন রাজত্ব করেন। শূরপালের পর রাজা হন তাঁর ছোটভাই রামপাল।

রামপাল ১০৮২ সাল থেকে ১১২৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘদিন রাজত্ব করেন। সন্দ্ব্যাকর নন্দীর ‘রামচরিত’ থেকে আমরা রামপালের রাজত্বকাল সম্পর্কে জানতে পারি। রামপাল বরেন্দ্রের বিদ্রোহী কৈবর্তদের পরাজিত করে বরেন্দ্র পুনরায় দখল করেন। এ সময় কৈবর্তদের নেতা ছিলেন ভীম। কৈবর্তদের দমন করতে রামপালকে সাহায্য করেন তাঁর মামা মখন। তিনি ছিলেন রাস্ট্রকূট রাজা। তা ছাড়া, বাংলার বেশ কয়েক জন সামন্ত রাজার সাহায্যও রামপাল পান। রামপাল বরেন্দ্রে একটি রাজধানী স্থাপন করেন। এর নাম দেওয়া হয় রামাবতী। বরেন্দ্রে পানিকষ্ট দূর করার জন্য ও কৃষির উন্নতির জন্য তিনি অনেক দিঘি খনন করেন। দিনাজপুর শহরের নিকট যে ‘রামসাগর’ রয়েছে তা রামপালের কীর্তি। রামপাল উড়িষ্যা এবং কামরূপও জয় করেন। তাঁর রাজত্বকালে পাল গৌরব যেন শেষবারের মতো জ্বলে উঠেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে পাল বংশের চূড়ান্ত পতন হয়। বাংলায় নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এ বংশের নাম সেন বংশ।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার দেব ও চন্দ্র বংশ

গুপ্ত যুগের পর থেকে সেন বংশের ক্ষমতায় আসা পর্যন্ত সময়কালে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানীয় রাজবংশের শাসনাধীনে ছিল। এ সকল রাজবংশ স্বাধীন ছিল। পাল শাসনামলেও সমস্ত বাংলা সকল সময়ের জন্য পাল সাম্রাজ্যের অধিকারে ছিল না। এ সময়কালে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় খড়্গ বংশ, দেব বংশ, চন্দ্র বংশ ও বর্ম বংশের উদ্ভব হয়। নিচে দেব বংশ ও চন্দ্র বংশ সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

**দেব বংশ (আনুমানিক ৭৫০ সাল—৮০০ সাল) :** অষ্টম শতকের প্রথম ভাগে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় দেব বংশের উত্থান হয়। এ পর্যন্ত দেব বংশের চারজন রাজার নাম জানা গেছে। তাঁরা হচ্ছেন শ্রীশান্তিদেব, শ্রীবীরদেব, শ্রীআনন্দদেব ও শ্রীভবদেব। এ বংশের রাজাদের রাজধানী ছিল দেব পর্বতে। দেব পর্বত ময়নামতির দক্ষিণে অবস্থিত। দেব বংশের রাজারা ‘পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ’ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। অনুমান করা হয় যে, দেব বংশের রাজগণ ৭৫০ সাল থেকে ৮০০ সালের মধ্যে রাজত্ব করেছিলেন। সম্ভবত বাংলার মাৎস্যন্যায়ের একেবারে শেষ পর্যায়ে এ বংশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। খুব সম্ভব ধর্মপালের রাজত্বকালে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা পাল সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। এ বংশের রাজারা বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন। আনন্দদেব ময়নামতিতে ‘আনন্দ বিহার’ নামে একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেছিলেন। এ বিহার বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র ছিল।

**চন্দ্র বংশ (আনুমানিক ৯০০ সাল—১০৫০ সাল) :** দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় পাল বংশের শাসন দীর্ঘদিন টিকে থাকেনি। দেবপালের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই এ অঞ্চল স্বাধীন হয়ে যায়। এ বংশের স্বাধীনতা আনে যে বংশ তার নাম চন্দ্র বংশ। দেব ও পাল বংশের রাজাদের ন্যায় চন্দ্র বংশের রাজারাও বৌদ্ধ ছিলেন। দেবপালের পর কোনো এক সময় কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড়ি এলাকার পূর্ণচন্দ্র একটি রাজ্য স্থাপন করেন। পূর্ণচন্দ্রের পর রাজা হন তাঁর ছেলে সুবর্ণচন্দ্র। সুবর্ণচন্দ্রের পর তাঁর ছেলে ত্রৈলোক্যচন্দ্র রাজা হন।

**ত্রৈলোক্যচন্দ্র :** ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্র বংশের প্রথম শক্তিশালী রাজা। তাঁর শাসনকাল আনুমানিক ৯০০ সাল থেকে ৯৩০ সাল পর্যন্ত ছিল। তিনি হরিকেল অর্থাৎ চট্টগ্রাম ও সিলেট জয় করেন। চন্দ্রদ্বীপ অর্থাৎ বরিশাল এলাকাও তাঁর দখলে আসে।

**শ্রীচন্দ্র :** ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পর রাজা হন তাঁর ছেলে শ্রীচন্দ্র। তিনি ছিলেন চন্দ্র বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁর রাজত্বকাল আনুমানিক ৯৩০ সাল থেকে ৯৭৫ সাল পর্যন্ত ছিল। তিনি রাজ্যকে আরও বড় করেন। বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে তিনি রাজধানী স্থাপন করেন।

**কল্যাণচন্দ্র :** শ্রীচন্দ্রের পর তাঁর ছেলে কল্যাণচন্দ্র রাজা হন। তিনি বংশের গৌরব ধরে রাখতে পেরেছিলেন। দাতা, সত্যবাদী ও বীর হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি প্রায় ২৫ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর শাসনকাল আনুমানিক ৯৭৫ সাল থেকে ১০০০ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

**লডহচন্দ্র :** কল্যাণচন্দ্রের পর রাজা হন তাঁর ছেলে লডহচন্দ্র। তিনি আনুমানিক ১০০০ সাল থেকে ১০২০ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনিও বংশের গৌরব ধরে রাখতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন ধার্মিক, কবি ও পণ্ডিত।

**গোবিন্দচন্দ্র :** লডহচন্দ্রের পর তাঁর ছেলে গোবিন্দচন্দ্র রাজা হন। তিনি ছিলেন চন্দ্র বংশের শেষ রাজা। তিনি আনুমানিক ১০২০ সাল থেকে ১০৫০ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন পণ্ডিত ও গুণবান।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পাল রাজা ধর্মপাল সম্পর্কে নিচের কোন উক্তিটি সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য?  
 ক. তিনি প্রায় ৪০ বছর রাজত্ব করেন  
 খ. বাংলার বাইরেও বেশ কিছু অঞ্চল জয় করেছিলেন  
 গ. ত্রিপক্ষীয় যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন  
 ঘ. তিনি বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন

### নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২-৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলার ইতিহাসে শক্তিশালী শাসকের অভাবে চরম অরাজকতার সৃষ্টি হয়। পাল শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে এ অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটে। এ রাজবংশ বাংলায় প্রায় চারশো বছর রাজত্ব করে।

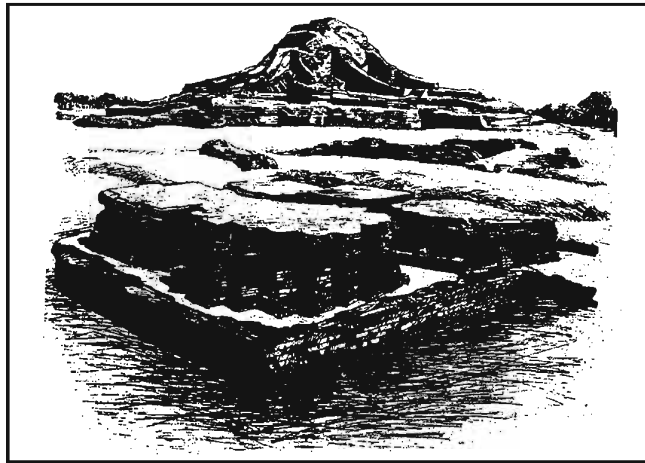
২. পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?  
 ক. গোপাল  
 খ. ধর্মপাল  
 গ. দেবপাল  
 ঘ. রামপাল
৩. পাল রাজত্বের অবসান ঘটে—  
 i. দীর্ঘদিনের রাজত্ব  
 ii. চারিত্রিক দুর্বলতা  
 iii. যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাব

### নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii  
 খ. ii ও iii  
 গ. i ও iii  
 ঘ. i, ii ও iii
৪. ত্রিপক্ষীয় যুদ্ধের সঙ্গে প্রাচীন বাংলার কোন শাসকের নাম জড়িত—  
 ক. রামপাল  
 খ. ধর্মপাল  
 গ. দেবপাল  
 ঘ. প্রথম মহীপাল
৫. চন্দ্রদ্বীপ বর্তমান বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের নামের সঙ্গে জড়িত?  
 ক. সিলেট  
 খ. চট্টগ্রাম  
 গ. মুন্সিগঞ্জ  
 ঘ. বরিশাল
৬. চন্দ্র বংশের শেষ রাজা কে ছিলেন?  
 ক. গোবিন্দচন্দ্র  
 খ. লডহচন্দ্র  
 গ. শ্রীচন্দ্র  
 ঘ. ত্রৈলোক্যচন্দ্র

### সৃজনশীল প্রশ্ন

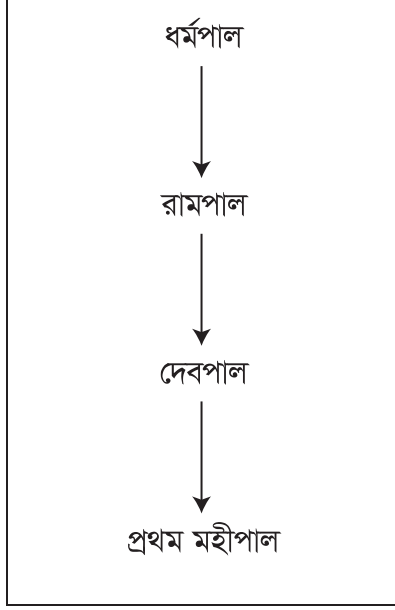
১.



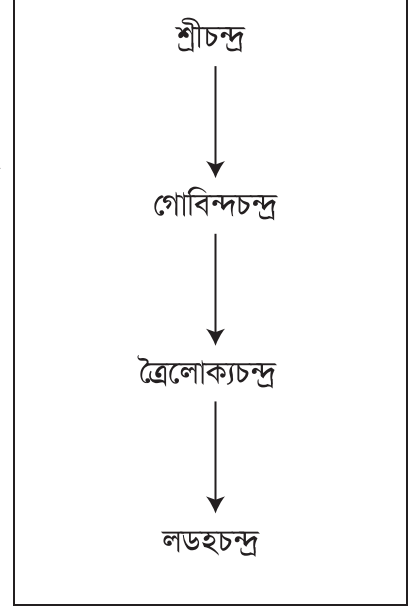
চিত্র : পাহাড়পুর বিহার

- ক. উপরে উল্লিখিত চিত্রটি প্রাচীন বাংলার কোন শাসনামলের?  
 খ. উল্লিখিত চিত্রটি কেন বিখ্যাত ছিল?  
 গ. উল্লিখিত চিত্রটির সঙ্গে ময়নামতি বিহারের মিল খুঁজে বের কর।  
 ঘ. মনে কর তুমি পাহাড়পুর বিহার ভ্রমণে গিয়েছ। এ সম্পর্কে তোমার অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।
২. নিচে প্রাচীন বাংলার দুটো বংশের কতিপয় রাজার পরিচয় উল্লেখ করা হল—

চিত্র - ১



চিত্র - ২



- ক. উল্লিখিত চিত্র-২ প্রাচীন বাংলার কোন রাজবংশের?  
 খ. উল্লিখিত চিত্র-১ এর প্রতিষ্ঠাতা রাজার একটি কৃতিত্ব বর্ণনা কর।  
 গ. উল্লিখিত চিত্র-১ ও চিত্র-২ এর দুটো বংশের শাসনামলের ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে কোনো অমিল পরিলক্ষিত হলে তা সময়ক্রমিকভাবে সাজিয়ে লেখ।  
 ঘ. উল্লিখিত চিত্র-১ এর কোন শাসককে তুমি শ্রেষ্ঠ বলে মনে কর? মতামত দাও।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

# বাংলায় সেন শাসন-মুসলমানদের আগমন

বাংলায় সেন বংশের শাসন খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেনগণ বাংলার বাইরে থেকে এদেশে আসেন। তাদের আদি নিবাস ছিল দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটে। প্রথমে এরা ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে ক্ষত্রিয় হন। সামন্তসেন ছিলেন একজন বিখ্যাত যোদ্ধা। তিনি কর্ণাট থেকে এসে রাঢ় অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। তিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এমন কোনো প্রমাণ নেই। খুব সম্ভব তাঁর ছেলে হেমন্তসেন পাল রাজা রামপালের একজন সামন্ত ছিলেন। হেমন্তসেনের পর বিজয়সেন ক্ষমতায় আসেন।

### বিজয়সেন (১০৯৮-১১৬০ সাল)

বিজয়সেন ছিলেন সেন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি দীর্ঘদিন ক্ষমতায় ছিলেন। তাঁর শাসনকাল ১০৯৮ সাল থেকে ১১৬০ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। বিজয়সেন শূর বংশের রাজার মেয়ে বিলাসদেবীকে বিয়ে করেন। বিয়ের ফলে তিনি দক্ষিণ রাঢ়ের মালিক হন। এরপর তিনি পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার রাজা বর্মরাজকে পরাজিত করে দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার মালিক হন। তাঁর প্রথম রাজধানী ছিল রাজশাহী জেলার বিজয়পুরে। পরে তিনি বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। বাংলার অন্যান্য সামন্ত রাজারা তাঁর অধীনতা মেনে নেন। বিজয়সেন কামরূপ, কলিঙ্গ এবং মিথিলার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছিলেন বলে জানা যায়।

বিজয়সেন একজন সামন্ত রাজা থেকে সারা বাংলার রাজা হয়েছিলেন। এটা তাঁর জন্য খুবই গৌরবের বিষয়। তিনি বাংলাদেশ থেকে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করেন। তিনি ছিলেন শৈবধর্মের অনুসারী। তিনি ‘পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ’ উপাধি ধারণ করেছিলেন।

### বল্লালসেন (১১৬০-১১৭৮ সাল)

বিজয়সেনের পর বাংলার রাজা হন তাঁর ছেলে বল্লালসেন। তিনি ১১৬০ সাল থেকে ১১৭৮ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর আমলে বাংলায় সেন শাসন আরও দৃঢ় হয়। তিনি পিতার রাজ্যকে আরও বড় করেন। তিনি মগধ ও মিথিলা তাঁর অধিকারে আনেন।

পিতার মতো বল্লালসেনও ছিলেন শৈবধর্মের অনুসারী। তিনি নিজে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ‘দানসাগর’ ও ‘অদ্ভুত সাগর’ নামক দুখানা বই লেখেন। তিনি বিদ্বান ও গুণী মানুষকে সম্মান করতেন। শেষ জীবনে তিনি তাঁর ছেলে লক্ষ্মণসেনের হাতে রাজ্য চালনার ভার ছেড়ে দেন। তিনি গঙ্গা নদীর ধারে ত্রিবেণীর কাছে শেষ জীবন কাটান।

### লক্ষ্মণসেন (১১৭৮-১২০৫ সাল)

বল্লালসেন লক্ষ্মণসেনের হাতে রাজ্য চালনার ভার ছেড়ে দেন। তিনি ১১৭৮ সাল থেকে ১২০৫ সাল পর্যন্ত অনেক দিন রাজত্ব করেন। তিনি যেমন ছিলেন বীর, তেমনি ছিলেন জ্ঞানী-গুণীদের প্রতি উদার। পিতা ও পিতামহের আমলে তিনি রাজ্যজয়ে অংশ নেন। তিনি বেশি বয়সে সিংহাসনে বসেছিলেন। তাই রাজত্বের শেষদিকে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে। তিনি খুব দুর্বল হয়ে পড়েন। রাজ্যের কর্মচারী এবং লোকজনও ছিল অলস। দেশের প্রতি তাদের কোনো দরদ ছিল না। তারা শুধু নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকত। এর ফলে বেশ কয়েকজন সামন্ত রাজা খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ওদিকে মুসলমানগণ উত্তর ভারত জয় করে ফেলেছিল। তারা রাজ্য জয় করতে করতে ক্রমশ পূর্বদিকে এগিয়ে আসছিল।

১২০৪-০৫ সালে মুসলমান সেনাপতি বখতিয়ার খলজি হঠাৎ করে সেন রাজ্য আক্রমণ করেন। রাজা লক্ষ্মণসেন তখন ছিলেন নদীয়ায়। বখতিয়ার একরকম বিনা বাধায় নদীয়া জয় করে নেন। লক্ষ্মণসেনকে পূর্ব বাংলার বিক্রমপুরে পালিয়ে আসতে হয়। এরপর তিনি লক্ষ্মণাবতী জয় করেন। এটিই ছিল তখনকার বাংলার রাজধানী। মুসলমানেরা লক্ষ্মণাবতীকে

বলত ‘লখনৌতি’। বখতিয়ার খলজি কর্তৃক নদীয়া ও লক্ষ্মণাবতী জয়ের মধ্য দিয়েই বাংলার উত্তরাঞ্চলের প্রথম মুসলিম শাসনের সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে বাংলার সকল অঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে আসে।

লক্ষ্মণসেন পূর্ব বাংলার কিছু অংশে আরও কিছু দিন রাজত্ব করেন। ১২০৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

লক্ষ্মণসেন শেষ বিখ্যাত হিন্দু রাজা ছিলেন। তিনি দানশীল ছিলেন। কবি-সাহিত্যিকদের তিনি সমাদর করতেন। ধোয়ী, শরণ, জয়দেব, গোবর্ধন, উমাপতিধর প্রমুখ কবি তাঁর দরবারে ছিলেন। লক্ষ্মণসেন নিজেও পণ্ডিত ছিলেন। বল্লালসেন তাঁর বই ‘অদ্ভুত সাগর’ শেষ করে যেতে পারেননি। লক্ষ্মণসেন এটি শেষ করেন। লক্ষ্মণসেন বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। তিনি খুব উদার মানুষ ছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ তাঁর খুব প্রশংসা করেছেন।

### মুসলমানদের আগমন

**প্রাথমিক যোগাযোগ:** মুসলমানদের বাংলাদেশ জয়ের আগে থেকেই তাঁরা বাংলাদেশে আসতে থাকে। অষ্টম শতক থেকেই মুসলমানগণ ব্যবসার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম আসে। এরপর তাদের আগমন বাড়তে থাকে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ইত্যাদি স্থানে বাস করতে শুরু করে। সমুদ্রের তীরে হওয়ায় তাদের পক্ষে এ সকল স্থানে ব্যবসা করতে সুবিধা হত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার স্থানীয় মহিলাদের বিয়ে করে। এভাবে ধীরে ধীরে এ সকল অঞ্চলে মুসলমান বসতি ও মুসলমান সমাজ গড়ে ওঠে। একাদশ শতকে কয়েকজন সুফি দরবেশ এ দেশে আসেন। তাদের মধ্যে শাহ সুলতান রুমী একজন। তিনি ১০৫৩ সালে ময়মনসিংহে আসেন। এর প্রায় দেড়শ বছর পর (১১৯৯ সাল) বাবা আদম আসেন বিক্রমপুরে। এ সকল সুফি দরবেশ যেখানে আস্তানা করতেন তাকে বলা হত ‘খানকাহ’। দরবেশগণ খুব পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। নিচুবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধদের ওপর উঁচুবর্ণের হিন্দুরা খুব অত্যাচার করত। তাদের সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অধিকার ছিল না বললেই চলে। অপরদিকে ইসলামধর্মের মূলকথা হল এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস এবং সকলের সমান অধিকার। তাই এ সকল দরবেশের নিকট বেশকিছু লোক ইসলামধর্ম গ্রহণ করে।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. শাহসুলতান বুমি ছিলেন একজন—  
 ক. ঐতিহাসিক  
 গ. সাহিত্যিক  
 খ. সুফিদরবেশ  
 ঘ. শাসক
২. শাসক হিসেবে লক্ষণসেন দুর্বল হয়ে পড়েন, কারণ—  
 i. রাজত্বের শেষদিকে তার শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে  
 ii. দেশের প্রতি দরদ না থাকায় শাসনের ব্যাপারে মনোযোগ হারান  
 iii. রাজ্যের কর্মচারী এবং লোকজন অলস হয়ে পড়ে

### নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i  
 গ. ii ও iii  
 খ. i ও iii  
 ঘ. i, ii ও iii
৩. সেন বংশের রাজাগণ সম্পর্কে প্রযোজ্য ছিল, তাঁরা—  
 i. ধর্মীয় সহিষ্ণু ছিলেন  
 ii. শিক্ষা সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন  
 iii. তাঁদের আদিনিবাস বাংলার বাইরে ছিল

### নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii  
 গ. i ও iii  
 খ. ii ও iii  
 ঘ. i, ii ও iii

### সৃজনশীল প্রশ্ন

পাল বংশের পতনের পর বাংলায় সেন বংশের শাসন শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে বিজয়সেন, বল্লালসেন, লক্ষণসেন প্রমুখ শাসনকার্য পরিচালনা করেন। একই সময়ে বাংলায় মুসলমানদের আগমন ঘটতে থাকে। পাশাপাশি নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধরা ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে থাকে।

- ক. সেন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন?
- খ. স্থানীয় অধিবাসীরা কেন ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন?
- গ. লক্ষণসেনের পতনের কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. বিজয়সেনের কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর।



## প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

বাংলার প্রাচীন যুগের প্রথমদিকের তেমন কোনো লিখিত উৎস নেই। তাই প্রাচীন বাংলার মানুষ কী ধরনের জীবনযাপন করত সে সম্পর্কে আমরা সঠিক কিছু জানি না। তবে তামার পাতে কিংবা পাথরে খোদাই করা কিছু কিছু লেখা থেকে সে আমলের মানুষের শিল্প, সাহিত্য এবং অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্পর্কে আমরা ধারণা করতে পারি।

**সাহিত্য :** বাংলার আদিম অধিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। আর্যরা কথা বলত বৈদিক ভাষায়। বৈদিক ভাষাকে সংস্কার করে সৃষ্টি হয় সংস্কৃত ভাষা। ব্রাহ্মণদের ভাষা ছিল সংস্কৃত, আর সাধারণ মানুষ কথা বলত প্রাকৃত ভাষায়। পরবর্তীকালে প্রাকৃত ভাষাকে গুছিয়ে সুন্দর করে লেখার ভাষায় রূপ দিলে দুইটি ভাষার সৃষ্টি হয়—একটির নাম পালি, অপরটির নাম অপভ্রংশ। অপভ্রংশ থেকে পূর্ব ভারতে অনেকগুলো ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের বাংলা ভাষারও সৃষ্টি হয়েছে অপভ্রংশ থেকে। অষ্টম-নবম শতকে জন্ম হয় বাংলা ভাষার। চর্যাপদের ভাষা বাংলা লেখ্য ভাষার আদিরূপ। চর্যাপদ রচনা করা হয় পাল আমলে। যারা চর্যাপদ রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে কাহ্নপাদ ছিলেন অন্যতম। পাল আমলের লেখক ও কবিদের মধ্যে বিশাখ দত্ত ও মুরারি বৈশ্য নামকরা। সন্দ্বীপের নন্দীর ‘রামচরিত’ একটি বিখ্যাত বই। চক্রপাণি এ যুগে চিকিৎসা বিষয়ে বই লেখেন। সেন আমলে সংস্কৃত সাহিত্যের খুব উন্নতি হয়। এ সময়কার কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে শরণ, উমাপতিধর, হলায়ুধ, জয়দেব ও গোবর্ধন খুবই নামকরা।

**অর্থনৈতিক কাজকর্ম :** প্রাচীন যুগে বাংলার মানুষের মূল পেশা ছিল কৃষিকাজ। ধান আর আখের চাষ হত সবচেয়ে বেশি। আখের রস থেকে তৈরি হত গুড় আর চিনি। কেউ কেউ পশুপালনও করত। গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট কুটিরশিল্প গড়ে উঠেছিল। দেশেই তুলার চাষ হত। তাঁতিরা তাঁতে কাপড় বুনত। অনেকেই কামার ও ছুতারের কাজ করত। এরা নৌকা, গাড়ির চাকা, লাঙল ইত্যাদি তৈরি করত। বাংলাদেশে বহু ধরনের নৌকা তৈরি হত। মণিকার ও স্বর্ণকারেরা নানারকম গয়না তৈরি করত। কুমারেরা তৈরি করত মাটির খেলনা ও গৃহস্থালি জিনিসপত্র।

**ব্যবসা-বাণিজ্য :** কৃষিকাজ ও শিল্পের পাশাপাশি প্রাচীন বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্যেরও উন্নতি হয়েছিল। সাধারণত নদীর তীরে তীরে গড়ে উঠেছিল হাট-বাজার ও গঞ্জ। শহরগুলো ছিল বাণিজ্যের কেন্দ্র। ব্যবসা-বাণিজ্য নদীপথেই হত বেশি। বণিকেরা বড় বড় নৌকায় মালপত্র দেশের বাইরেও নিয়ে যেত।

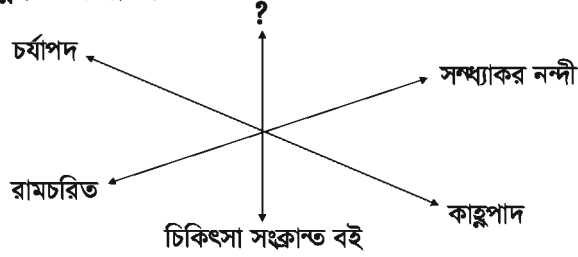
**খেলাধুলা, পূজা-পার্বণ, পোশাক ও আমোদ-প্রমোদ :** খেলাধুলার মধ্যে দাবা ও পাশা খেলার খুব প্রচলন ছিল। তা ছাড়া বিভিন্ন ধরনের কুস্তি খেলা হত। দেশে বিভিন্ন ধরনের পূজা-পার্বণের প্রচলন ছিল। প্রাচীন বাংলার লোকেরা বিষ্ণুকর্মা, শীতলা, মনসা, বনদুর্গা, চণ্ডী, ষষ্ঠী, কালী, শিব ইত্যাদি দেবদেবীর পূজা করত। তা ছাড়া রথযাত্রা, অষ্টমী স্নান ইত্যাদিও প্রচলিত ছিল। পুরুষের পোশাক ছিল ধুতি-চাদর আর মেয়েরা পরত শাড়ি-ওড়না। মেয়েরা নানারকম গয়না পরত। মেয়েরা মাথায় খোঁপা বাঁধত। বিবাহিত মেয়েরা সিঁথিতে সিঁদুর দিত। পুরুষেরা বাবরি রাখত। অনেক সময় তারা মাথায় টোপের পরত। সে যুগের মানুষ শিকার করে খুব আমোদ পেত। শিকারের মধ্যে হরিণ শিকারই ছিল প্রধান। বিয়ের সময় খুব আমোদ-প্রমোদ করা হত। গান-বাজনা ছিল আমোদ-প্রমোদের অংশ। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ঢোল ও বীণার খুব কদর ছিল।

**শিল্প ও স্থাপত্য :** প্রাচীন বাংলার দালানকোঠা, মন্দির ইত্যাদি এখন আর অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায় না। মহাস্থানগড় এবং পাহাড়পুর ও ময়নামতির বিহার প্রমাণ করে যে সেই যুগে স্থাপত্য শিল্পের বেশ উন্নতি হয়েছিল। মূর্তি ইত্যাদি তৈরিতেও সে যুগের লোকেরা বেশ উন্নতি করে। সে যুগে মূর্তি তৈরি করার জন্য কষ্টিপাথর, অষ্টধাতু, সোনা ও রূপা ব্যবহার করা হত। পোড়ামাটির ফলক দিয়ে সে যুগের দালানকোঠা ও মন্দিরগুলো সাজানো হত। পাল যুগের শিল্পীদের মধ্যে ধীমানপাল ও তার ছেলে বীটপালের খুব সুনাম ছিল। সেন যুগের একজন বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন শূলপাণি।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের চিত্র থেকে ১ ও ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :



১. ওপরের চিত্রে (?) চিহ্নিত স্থানে হবে—

- ক. বিশাখ দত্ত  
গ. উমাপতিধর

- খ. চক্রপাণি  
ঘ. গোবর্ধন

২. চর্যাপদ—

- i. বাংলা লেখ্য ভাষার আদিরূপ  
iii. রচয়িতাদের অন্যতম কাহ্নপাদ

- ii. সংস্কৃত ভাষার আদিরূপ

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i ও ii  
গ. i ও iii

- খ. ii ও iii  
ঘ. i, ii ও iii

৩. পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতি প্রমাণ করে প্রাচীন বাংলা—

- i. স্থাপত্য শিল্পে যথেষ্ট উন্নত ছিল  
ii. সাহিত্যে প্রভূত উন্নত ছিল  
iii. ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নত ছিল

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i  
গ. i ও iii

- খ. i ও ii  
ঘ. i, ii ও iii

### সৃজনশীল প্রশ্ন

১. শুচি ৬ষ্ঠ শ্রেণীর একজন ছাত্রী। তার এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষক প্রাচীন বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা দেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বাংলা ভাষা চর্চা ও বিকাশে চর্যাপদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। তাছাড়া তৎকালীন প্রাচীন বাংলার প্রচলিত হিন্দুধর্মের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের একটি চিত্র তুলে ধরেন।

ক. 'চর্যাপদ' এর রচয়িতা কে ?

খ. চর্যাপদের সঙ্গে প্রকৃত ভাষার সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

গ. শুচি কীভাবে বর্তমান হিন্দুধর্মের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রাচীন বাংলার হিন্দুধর্মের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে ?

ঘ. সাহিত্যে প্রাচীন বাংলার লেখক ও কবিদের অবদান ব্যাখ্যা কর।

২. নুসরাত ময়নামতি জাদুঘরে গিয়ে প্রাচীন বাংলার প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিসপত্র দেখে বিস্মিত হল। ময়নামতি বিহারের স্থাপনা দেখে সে আরও অবাক হল এ কারণে যে, আজ থেকে প্রায় হাজার বছর পূর্বে সে যুগের শিল্পী এবং স্থপতিরা ছিলেন চিন্তায় এবং মননে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এ প্রসঙ্গে সে তার পাঠ্যবই থেকে পাল এবং সেন যুগের বিখ্যাত ক'জন শিল্পীর অবদানকে ভালোই স্মরণ করতে পারল। সে যুগের কিছু অর্থনৈতিক কাজের নিদর্শনও শিল্পীমনের পরিচয় বহন করে।

ক. ময়নামতি কোথায় অবস্থিত ?

খ. অর্থনৈতিক কাজের নিদর্শনগুলো কীভাবে শিল্পীমনের পরিচয় বহন করছে?

গ. ময়নামতি বিহারের নিদর্শনগুলো কীভাবে নুসরাতকে প্রাচীন বাংলার শিল্প ও স্থাপত্যের উন্নতি সম্পর্কে ধারণা দেয়—ব্যাখ্যা কর।

ঘ. প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক কাজগুলো এখনও গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—বিশ্লেষণ কর।

## পঞ্চম অধ্যায়

# পৌরনীতির পরিচয় ও বিষয়বস্তু

### পৌরনীতির সংজ্ঞা

পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Civics (সিভিক্স)। এই Civics শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Civis (সিভিস) এবং Civitas (সিভিটাস) থেকে এসেছে। এ দুইটি শব্দের অর্থ হল নাগরিক ও নগর রাষ্ট্র। নগর রাষ্ট্র (সিটি স্টেট) বলতে একটি নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রকে বোঝায়। প্রাচীন গ্রিস ও রোমে এ ধরনের ছোট ছোট নগর রাষ্ট্র ছিল। এর উদাহরণ এথেন্স, স্পার্টা, রোম, সিসিলি, কোরিন্থ ইত্যাদি। আর সেকালে নাগরিক বলতে বোঝাত এসব নগর রাষ্ট্রের সম্পত্তির মালিক উচ্চশ্রেণীর মুষ্টিমেয় লোকদেরকে। এরা একই সঙ্গে শাসক ও শাসিত হত। প্রাচীন গ্রিসের নগর রাষ্ট্রীয় যুগের দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল এবং আইন বিশারদ সোলন, লাইবারগাছ প্রমুখও নাগরিকত্ব সম্পর্কে এরকম ধারণা দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানকালে নাগরিক ও নগর রাষ্ট্রের ধারণা বদলে গেছে। সেই ছোট ছোট নগর রাষ্ট্র এখন আর নেই। এক নগরের বদলে এখন বহু গ্রাম, ছোটবড় শহর, নগর-বন্দরসহ বিরাট ভূখণ্ড নিয়ে জাতি রাষ্ট্র (নেশন স্টেট) গড়ে উঠেছে। বিপুল জনগোষ্ঠী নিয়ে আধুনিক জাতি রাষ্ট্র গঠিত। তবে পৃথিবীতে যেমন বৃহৎ রাষ্ট্র রয়েছে, তেমনি ক্ষুদ্র বা ছোট ছোট অনেক রাষ্ট্রও রয়েছে। বৃহৎ রাষ্ট্রের উদাহরণ হচ্ছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রুটন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, গণচীন। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের উদাহরণ হচ্ছে ভুটান, মোনাকো, শাদ, লাইবেরিয়া, বতসোয়ানা। রাষ্ট্র হিসেবে ছোটবড় সবগুলোই আনুষ্ঠানিক সমমর্যাদা লাভ করেছে। নাগরিক শব্দের অর্থও বর্তমানে পুরোপুরি বদলে গেছে। নাগরিক বলতে এখন আর শুধু নগর রাষ্ট্রের উচ্চবিত্ত দাসমালিক মুষ্টিমেয় অবসরভোগী শাসক-শাসিতদেরই বোঝায় না। নাগরিক হল সেসব দেশবাসী মানুষ যারা একটি রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বাস করে, রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করে, রাষ্ট্র কর্তৃক সংবিধান অনুযায়ী প্রদত্ত অধিকারসমূহ ও বিভিন্ন রকম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে এবং সরকার গঠন করে। যেমন, বাংলাদেশ এরকম একটি রাষ্ট্র এবং আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক।

এখন পৌরনীতি বা পৌরবিজ্ঞান বলতে আমরা কী বুঝি? এককথায় পৌরনীতি হচ্ছে নাগরিকতা সম্পর্কিত বিষয় বা বিজ্ঞান। আমরা জানি আজকের পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে রাষ্ট্রে বসবাস করে। একটি রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী সব মানুষই সে রাষ্ট্রের নাগরিক। তারা প্রত্যেকেই নাগরিক জীবন বা পৌর জীবনযাপন করে। এই নাগরিক জীবনের সঙ্গে জড়িত সবরকম অবস্থা, সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে যে বিষয় আলোচনা করে, তা-ই পৌরনীতি। অন্যভাবে আমরা বলতে পারি, পৌরনীতি হল সেই জ্ঞান, যা রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে মানুষের চলাফেরা, কাজকর্ম, অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করে। নাগরিক জীবনের সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজকর্ম ও নাগরিকদের সঙ্গে এদের সম্পর্কের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনাও পৌরনীতির আওতাভুক্ত। অর্থাৎ নাগরিকতার সঙ্গে জড়িত সবরকম উপাদান ও প্রশ্ন নিয়ে যে বিষয় আলোচনা করে, তাকে পৌরনীতি বলে। সুপ্রসিদ্ধ লেখক অধ্যাপক ই এম হোয়াইট বলেছেন, ‘পৌরনীতি হল কালের সেই মূল্যবান শাখা যা নাগরিকদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।’ এ থেকে আরও দেখা যাচ্ছে, কেবল স্থানীয় ও দেশের ভেতরকার বিষয়াদিই পৌরনীতির আওতাভুক্ত, তা নয়। পৌরনীতি দেশের বাইরের আন্তর্জাতিক বিশ্বের মানবগোষ্ঠীর ও প্রতিষ্ঠানাদির কাজকর্ম, আচরণ ও পারস্পরিক সম্পর্কও আলোচনা করে। বিশ্ব মানব ভ্রাতৃত্বের লক্ষ্য আর সচেতনতাও পৌরনীতির আওতায় এসে যায়।

অনেকে মনে করেন, যেসব প্রতিষ্ঠান, অভ্যাস ও কার্যাবলির মাধ্যমে মানুষ রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে এবং রাষ্ট্রের কাছ থেকে অধিকার ভোগ করে, তা জানার বিষয়ই হল পৌরনীতি বা পৌরবিজ্ঞান।

আধুনিক রাষ্ট্র আকারে বড় এবং জনসংখ্যাও বেশি। এজন্য আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের কাজকর্ম যেমন ভিন্ন তেমনি জটিল। বর্তমান যুগে একজন নাগরিককে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বহুরকম কাজ সম্পন্ন করতে হয়। তা ছাড়া একজন নাগরিক একই সময়ে পরিবার, গ্রাম, সমাজ ও রাষ্ট্রের সদস্য। পৌরনীতি নাগরিকদের এসব বহুমুখী কাজের ধারা ও বিভিন্ন সংগঠন সম্পর্কে ধারণা দান করে এবং আদর্শ নাগরিক জীবনের শিক্ষা দেয়।

## পৌরনীতির বিষয়বস্তু

পৌরনীতির আলোচ্য বিষয় ব্যাপক। কারণ, আধুনিক যুগে মানুষের জীবন রাজনীতি ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে তাকে আর আলাদা করে ভাবা যায় না। আধুনিক নাগরিককে তার দৈনন্দিন জীবনে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, নৈতিক ইত্যাদি বহুরকম সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। এসব সমস্যার সমাধান করতে গেলে সমাজের বিভিন্ন বিষয় ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানা দরকার। তাই আজকের নাগরিককে কেবল তার নাগরিক জীবন অর্থাৎ রাষ্ট্র বা পৌরজীবনের মাঝে সীমাবদ্ধ করে রাখা যায় না। পৌরনীতি মানুষের নাগরিক জীবন ছাড়াও সমাজের অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

১। নাগরিকতা ও রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্ক: পৌরনীতি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে মানুষের বিভিন্ন প্রকার আচরণ ও কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে। একজন নাগরিকের রাষ্ট্রের সঙ্গে কী সম্পর্ক, অন্যান্য নাগরিকের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক এসব নিয়ে পৌরনীতি আলোচনা করে। এ ছাড়া একজন নাগরিককে কী অবস্থার মাঝে কী কী আইন মেনে চলতে হবে, রাষ্ট্রের সঙ্গে তার কীরূপ সম্পর্ক অর্থাৎ রাষ্ট্রের কাছে কী কী অধিকার রয়েছে অথবা থাকা উচিত অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রতি তার কী কী দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তাও পৌরনীতিতে আলোচিত হয়। সেই মতে, সরকারের গঠনের প্রক্রিয়া, সরকারের কার্যাবলির পর্যালোচনা, সরকারের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্ক আলোচনাও পৌরনীতির অন্তর্ভুক্ত। আবার স্থায়ী ও জাতীয় প্রশাসন, আইনসভা, সংবিধান ও সাধারণ আইন, আদালত, বিভিন্ন সংঘ, সংগঠন, জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানাদি, নির্বাচন, নির্বাচকমণ্ডলী-এসবও পৌরনীতির আলোচনায় এসে যায়। এ ছাড়া পৌরকর্পোরেশন, উপজেলা পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্ক নিয়েও পৌরনীতি বা পৌরবিজ্ঞান জ্ঞান দান করে।

২। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা: পৌরনীতি নাগরিকের কেবলমাত্র বর্তমান অবস্থা, অধিকার ও কর্তব্য নিয়েই আলোচনা করে না, তার অতীত ও ভবিষ্যৎ অবস্থানও এর আলোচনার বিষয়। কীভাবে মানুষের মনে প্রথম নাগরিকতার ধারণার জন্ম হয়েছিল, তখন তাদের কী অধিকার ও কর্তব্য ছিল, কীভাবে যুগ যুগ ধরে এ ধারণা বিকাশ লাভ করে বর্তমান অবস্থায় এসেছে, আর ভবিষ্যতেই নাগরিকতা কীরূপ ধারণ করবে, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য কী হওয়া উচিত-পৌরনীতি এসবও আলোচনা করে।

৩। রাজনৈতিক ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান: আজকের নাগরিক শুধু রাষ্ট্রেরই সদস্য নয়, সে সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেরও সদস্য। যেমন, পরিবার, গ্রাম, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, বণিক সমিতি, শ্রমিক সমিতি, বিভিন্ন ক্লাব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানেরও সদস্য হয়ে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে একজন সদস্য নানারকম সুবিধা ভোগ করে। আবার এসব প্রতিষ্ঠানের নানারকম নিয়মকানুনও তাকে মেনে চলতে হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি সদস্যদের অনেক দায়িত্বও থাকে। নাগরিকদের এসব স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কার্যাবলি এবং বিবিধ অধিকার ও কর্তব্য পৌরনীতির আলোচ্য বিষয়।

৪। আন্তর্জাতিক বিষয়: বর্তমান পৃথিবীতে আর কোনো রাষ্ট্র একা চলতে পারে না। এক রাষ্ট্রকে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে চলতে হয়। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র আজ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। যেমন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এটি পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছিল। ফলে অতি স্বল্প সময়ের মাঝেই বিজয়লাভ সম্ভব হয়েছিল।

বর্তমান যুগে নাগরিকদের চিন্তা-ভাবনা ও কর্মক্ষেত্র বাইরের জগতে প্রসারিত হচ্ছে। এর ফলে জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আরও বহু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা সংঘ গড়ে উঠেছে, যেমন-ওআইসি, ইইউ, জি সেভেন, আসিয়ান, সার্ক ইত্যাদি। একটি রাষ্ট্র এসব আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান বা সংঘের সদস্য হতে পারে। নাগরিকরা তাদের রাষ্ট্রের সদস্যভূক্তির কারণে এগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। বিশ্বসমাজের সঙ্গে সংযুক্ত হবার কারণে রাষ্ট্র ও নাগরিককে নানাবিধ ভূমিকা পালন করতে হয়, কাজ সমাধান করতে হয়। আবার এসব থেকেও নানারকম অধিকার লাভ করে। এভাবে পৌরনীতির আলোচনা নাগরিকের কল্যাণ সাধন করে এবং তাকে বিশ্বসমাজের যোগ্য সদস্য হিসেবে গড়ে তোলে।

### পৌরনীতি পাঠের আবশ্যিকতা

আধুনিক যুগে কোনো ব্যক্তি বিচ্ছিন্নভাবে জীবনযাপন করতে পারে না। একদিকে সে যেমন সমাজের সদস্য, অপরদিকে সে কোনো একটি গ্রাম, শহর, নগর বা বন্দরের বাসিন্দা। আবার সে একটি রাষ্ট্রের সদস্য। এভাবে একজন মানুষ একটি পৌরজীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের অধিকারী। অর্থাৎ তার নাগরিক জীবন সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। নাগরিক হিসেবে ব্যক্তির যেমন কিছু সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকার আছে, তেমনি পৌরজীবনের কতকগুলো কর্তব্য ও দায়িত্ব তার রয়েছে। সচেতন সামাজিক জীবনযাপন করতে হলে পৌরজীবনের এসব জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।

পৌরনীতি শিক্ষার আবশ্যিকতা ও উপকারিতা অসীম। আধুনিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের দায়িত্বও অনেক বেশি। নাগরিকেরা তাদের প্রতিবেশী ও সরকারের প্রতি নিজ কর্তব্য কতটুকু পালন করে তার ওপর রাষ্ট্রের ভালোমন্দ নির্ভর করে। পৌরনীতি নাগরিকদের অধিকার সম্বন্ধে সজাগ করে এবং কর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়।

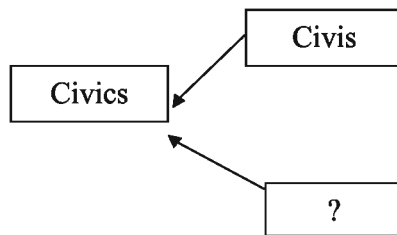
সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালনের নিয়মকানুন জানা প্রতিটি মানুষের অবশ্যকর্তব্য। পৌরনীতি পাঠে এসব জ্ঞান লাভ করা যায়। এ ছাড়া রাষ্ট্রের আইন ঠিকমতো মানা হচ্ছে কিনা এসব সম্পর্কেও পৌরনীতি আমাদের সচেতন করে তোলে। রাষ্ট্রের কল্যাণ ও সরকারের সফলতা সূনাগরিকের ওপর নির্ভর করে। নাগরিকেরা যদি নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ থাকে, তবেই রাষ্ট্র সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়। নাগরিক হিসেবে মানুষের অধিকার ও কর্তব্য জানতে হলে এবং সূনাগরিকের গুণাবলি অর্জন করতে হলে পৌরনীতি পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন। এ ছাড়া নাগরিক ও সমাজ জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পৌরনীতি রাষ্ট্র ও সমাজের নানা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে নাগরিকদের পরিষ্কার ধারণা দেয়।

সমাজের নানারকম ভুল বিশ্বাস ও কুসংস্কার রয়েছে, যেগুলো সমাজের ক্ষতিসাধন করে। পৌরনীতি মানুষের মনোভাবকে উদার করে এসব ভুল ধারণা ও কুসংস্কার দূর করে। পৌরনীতির শিক্ষা মানুষকে যেমন নিজের মতামত প্রকাশ করতে সাহায্য করে, তেমনি অন্যের মতামতকে সহ্য করার ক্ষমতাও দেয়। এ ছাড়া পৌরনীতি সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে মানুষকে সজাগ করে তোলে। রাষ্ট্র, সরকার, প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ব্যক্তির অবস্থান, ভূমিকা, দায়িত্বশীলতা, কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সচেতনতাও গড়ে তোলে পৌরনীতি।

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এবং দেশকে শক্তিশালী ও মর্যাদাশালী করে গড়ে তুলতে বাংলাদেশী নাগরিকদের পৌরনীতি শিক্ষা অত্যাাবশ্যিক।

### অনুশীলনী

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন



১. ওপরের চিত্রে (?) চিহ্নিত স্থানে কী হবে ?

ক. Civie

খ. Civies

গ. Civitas

ঘ. Civitus

২. নাগরিক হল—

- যারা রাষ্ট্রের সম্পত্তির মালিক এবং উচ্চশ্রেণীর মুষ্টিমেয় লোক
- যারা রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বাস করে এবং সরকার গঠন করে
- যারা রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করে এবং রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

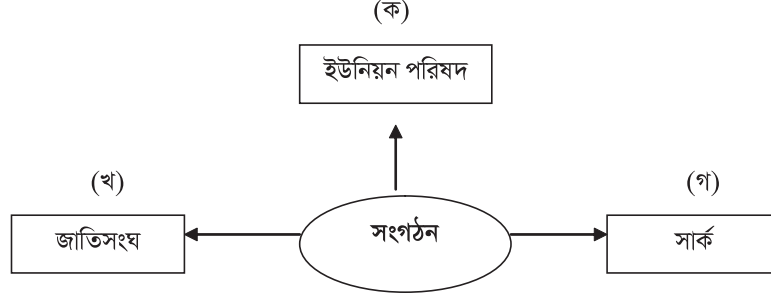
ক. i

খ. i ও ii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

চিত্রটি দেখ এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও—



৩. 'ক' চিহ্নিত সংগঠনটি কোন ধরনের সংগঠন ?

ক. সামাজিক

খ. জাতীয়

গ. স্থানীয়

ঘ. আন্তর্জাতিক

৪. পৌরনীতির আলোচ্য বিষয় হল—

i. স্থানীয় সংগঠন এবং তার কার্যাবলি

ii. আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং তার কার্যাবলি

iii. জাতিসংঘ এবং সার্কের গঠন ও কার্যাবলি

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

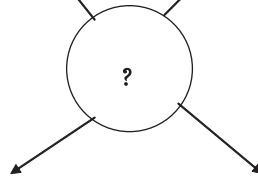
গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

নাগরিকতা ও রাষ্ট্রের  
সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্ক

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ  
নিয়ে আলোচনা



রাজনৈতিক ও স্থানীয়  
প্রতিষ্ঠান

আন্তর্জাতিক বিষয়

ক. “?” চিহ্নিত স্থানে কী হবে ?

খ. রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

গ. নাগরিক জীবনে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নাগরিক ও বিশ্ব মানব সমাজের মধ্যে সংযোগ তৈরিতে বিষয়টির প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

# ষষ্ঠ অধ্যায় নির্বাচন

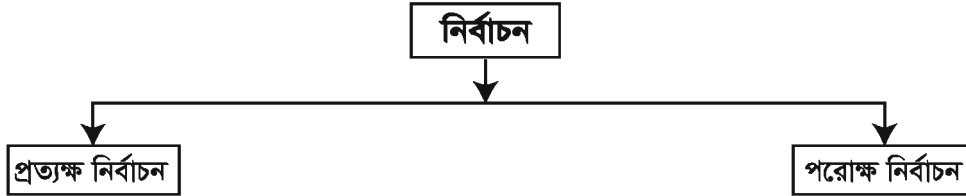
## নির্বাচন কী?

নির্বাচন নাগরিক জীবনের একটি অতি পরিচিত ঘটনা। আমাদের দেশে প্রায় প্রতি বছরই কোনো না কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যেমন: জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, উপজেলা পরিষদ নির্বাচন, পৌরসভা নির্বাচন, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ইত্যাদি। রাষ্ট্রের জনগণ এসব নির্বাচনে ভোট দিয়ে দেশ পরিচালনার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে থাকে। তাই স্বাভাবিকভাবেই জানতে ইচ্ছে করে নির্বাচন কী?

সাধারণ অর্থে কোনো কাজের জন্য একাধিক ব্যক্তি বা বস্তু বা বিষয়ের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি বা বস্তু বা বিষয় বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়াই হল নির্বাচন। যেমন, বিদ্যালয়ে কোনো শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের দ্বারা ঐ শ্রেণীর শ্রেণীনেতা নির্বাচিত হয়ে থাকে। আবার কোনো দলের দলনেতা ঐ দলের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়। অনেকগুলো পাঠ্যবিষয় থেকে যে কোনো একটি বা দুইটি বিষয় বেছে নেওয়াও একধরনের নির্বাচন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় জীবনে নির্বাচন কথাটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ অর্থে নির্বাচন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জনগণ ভোট দিয়ে দেশের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য উপযুক্ত প্রতিনিধি বাছাই করে। অর্থাৎ জনগণ কর্তৃক প্রতিনিধি বাছাইকরণ প্রক্রিয়াই হল নির্বাচন। নির্বাচনে ব্যক্তি নিজে ভোটের হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এবং তার যে ভোটদানের অধিকার সেটাই হল তার ভোটাধিকার। রাষ্ট্র নাগরিককে এই ভোটাধিকার দেয়। এটি নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার। আঠার বছর পূর্ণ হলেই নির্দিষ্ট শর্তে রাষ্ট্রের যে কোনো নাগরিক ভোটের হতে পারেন।

## নির্বাচন পদ্ধতি

নির্বাচন প্রধানত দুই ধরনের, যথা— (১) প্রত্যক্ষ নির্বাচন এবং (২) পরোক্ষ নির্বাচন। নিচে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।



**প্রত্যক্ষ নির্বাচন:** যে নির্বাচন পদ্ধতিতে জনগণ সরাসরি ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাকে প্রত্যক্ষ নির্বাচন বলে। আমাদের দেশে জাতীয় সংসদের সদস্যবৃন্দ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। অর্থাৎ জনগণ সরাসরি তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে।

**পরোক্ষ নির্বাচন:** এ পদ্ধতিতে জনসাধারণ সরাসরি প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পারে না। তারা প্রথমে ভোট দিয়ে একদল মধ্যবর্তী প্রতিনিধি নির্বাচিত করে। পরবর্তী পর্যায়ে এই মধ্যবর্তী প্রতিনিধিবৃন্দ ভোট দিয়ে চূড়ান্ত-প্রতিনিধি নির্বাচিত করে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে এ পদ্ধতিতে নির্বাচন হয় দুই বার। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। এতে ভোটাধিকারপ্রাপ্ত নাগরিকগণ প্রথমে জাতীয় সংসদের সদস্যদের নির্বাচিত করেন। এ সকল নির্বাচিত সদস্য পরবর্তীতে ভোট দিয়ে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করেন। এ ছাড়া নির্বাচনের আরও বিভিন্ন ধরন রয়েছে, যেমন –

**বহুদলীয় নির্বাচন পদ্ধতি:** এ ধরনের নির্বাচনে একাধিক রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বাংলাদেশে বহুদলীয় নির্বাচন পদ্ধতি চালু রয়েছে। আমাদের জাতীয় সংসদ নির্বাচন বহুদলীয় ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়।

**সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচন:** এ পদ্ধতিতে যিনি সর্বাধিক ভোট লাভ করেন তিনি নির্বাচিত হন।

এক এলাকা এক প্রতিনিধি নির্বাচন : এতে একটি নির্বাচনী এলাকা থেকে একাধিক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও এক জন মাত্র প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। যেমন, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

এক এলাকা একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচন : এতে একটি নির্দিষ্ট এলাকা থেকে একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। যেমন : ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ নির্বাচন।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ভোটাধিকার নাগরিকের কী ধরনের অধিকার ?  
 ক. সামাজিক  
 গ. মৌলিক  
 খ. রাজনৈতিক  
 ঘ. অর্থনৈতিক
২. পরোক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে—  
 i. জনগণ সরাসরি ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করে  
 ii. জনগণ একদল মধ্যবর্তী প্রতিনিধি নির্বাচন করে  
 iii. মধ্যবর্তী প্রতিনিধিবৃন্দ ভোট দিয়ে চূড়ান্ত প্রতিনিধি নির্বাচিত করে

### নিচের কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i        | খ. i ও ii      |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

### নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

পৃথিবীর সকল গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচন একটি সাধারণ ঘটনা। কোথাও একদলীয় কোথাও বহুদলীয় ব্যবস্থা চালু আছে। নির্বাচনের ধরন অনুযায়ী একজন অথবা একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।

৩. নির্বাচন প্রধানত কয় প্রকার ?  
 ক. ২  
 গ. ৪  
 খ. ৩  
 ঘ. ৫
৪. বাংলাদেশে নির্দিষ্ট এলাকা থেকে একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হন—  
 i. ইউনিয়ন পরিষদে  
 ii. জাতীয় সংসদে  
 iii. সিটি কর্পোরেশনে

### নিচের কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

### সৃজনশীল প্রশ্ন

বুনুরা ছোট একটি গ্রামে বাস করে। আগামীকাল তাদের গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন। নির্বাচন উপলক্ষে গ্রামে গত কয়েকদিন অনেক সভা-সমাবেশ হয়েছে। বুনুর মা-বাবা গ্রামের ভোটার। তারা ঠিক করেছেন কাল সকালবেলাতেই ভোট প্রদান করবেন। সামনে আরও অনেক নির্বাচন। সব নির্বাচনেই তারা ভোট প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তারা ভোট প্রদান করতে পারবেন না।

- ক. নির্বাচন কী ?
- খ. ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন কোন ধরনের নির্বাচন? ব্যাখ্যা কর।
- গ. বুনুর বাবা-মা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে কীভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বুনুর মা-বাবা কেন ভোট প্রদান করতে পারবেন না? ব্যাখ্যা কর।



## সপ্তম অধ্যায়

# মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

সমাজে বসবাসকারী মানুষ প্রতিদিন বিভিন্ন রকমের কাজ করে। এসব কাজের মধ্যে রয়েছে জীবিকা সংগ্রহের কাজ। মানুষের জীবিকা সংগ্রহের কাজ তার জীবনের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে জীবিকা সংগ্রহ করে। কেউ শারীরিক পরিশ্রম করে, কেউ বুদ্ধিগত শ্রম দান করে, আবার কেউ কেউ উভয় প্রকার কাজ করে জীবিকা সংগ্রহ করে। জীবিকার জন্য কেউ যায় কারখানায়, কেউ যায় অফিসে, আবার কেউ যায় খেতখামারে। জীবিকা সংগ্রহ ছাড়াও সমাজে বসবাসকারী মানুষকে আরও বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে হয়, যেমন খেলাধুলা, সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন, চিত্তবিনোদন ও সন্তান প্রতিপালন ইত্যাদি।

মানুষ জীবিকা সংগ্রহের জন্য যে কাজকর্ম করে থাকে তাকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বলা হয়। কৃষকেরা জমি চাষ করে; শ্রমিকেরা কলকারখানায় কাজ করে; পশুপালকেরা গরু, মহিষ, ভেড়া ও ছাগল চারণ করে; জেলেরা মাছ ধরে; ব্যবসায়ীরা ব্যবসা পরিচালনা করে। আবার অফিসে কর্মচারীরা কাজ করে, ডাক্তার রোগীদের চিকিৎসা করে, শিক্ষকেরা ছাত্রদের শিক্ষাদান করে। পরিবহণ শ্রমিকরা বাস, ট্রাক প্রভৃতি চালায়, শিল্পপতিরা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে, জমি ও বাড়ির মালিকেরা জমিজমা ও বাড়িঘর তদারকি করে। এ সবই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। তবে অসামাজিক কাজে লিপ্ত চোর, ডাকাত, চাঁদাবাজ, ছিনতাইকারী ইত্যাদি লোকের কাজ অর্থ আয় সংক্রান্ত হলেও এগুলো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে পড়ে না।

মানুষের এসব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা হল জীবিকা সংগ্রহের তাগিদ। সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ নানাভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জীবিকা সংগ্রহের চেষ্টা করে আসছে। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের প্রয়োজন হয় আহারের জন্য খাদ্য, বসবাসের জন্য বাড়িঘর এবং পরিধানের জন্য পোশাক।

আদিমকালে মানুষ বনজঙ্গল ও পাহাড়ের গুহায় বসবাস করত। গাছের ফলমূল, লতাপাতা, জীবজন্তু শিকার, পশুর চামড়া পরিধান প্রভৃতির মাধ্যমে জীবিকার প্রয়োজন মেটাতে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দলবদ্ধভাবে বসবাস করতে শুরু করে। পশুপালন ও চাষাবাদ আরম্ভ করে জীবিকার নতুন পথ বের করে। আদিমকালে মানুষের অভাব ছিল সীমিত। তাদের প্রয়োজনও ছিল সামান্য। সে সময়ে তারা স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল ছিল।

কিন্তু বর্তমান যুগে মানুষের অভাব ও প্রয়োজন ব্যাপক। এখন জীবিকার জন্য মানুষ একজন অপরজনের ওপর নির্ভরশীল। আধুনিক সমাজে অর্থ বা টাকা-পয়সার বিনিময়ে মানুষ বিভিন্ন কাজ করে। অর্থকে কেন্দ্র করে যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। এসব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষ অর্থ উপার্জন করে এবং জীবনধারণে বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য অর্থ ব্যয় করে। এ কারণে বর্তমান সমাজে অর্থ উপার্জন ও অর্থ ব্যয়ের জন্য মানুষকে যে কাজ করতে হয় তা হল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। সুতরাং মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মূল প্রেরণা অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে অর্থ উপার্জন ও অর্থ ব্যয়।

মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড রয়েছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড মানুষের অভাব পূরণ করে, কিন্তু এসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অর্থ উপার্জনের প্রশ্ন জড়িত থাকে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পিতামাতা সন্তানদের প্রতিপালন করে, অনেকে শখের বশে খেলাধুলা করে, ধার্মিক লোকেরা ধর্মচর্চা করে। এসব কাজের সঙ্গে অর্থ উপার্জনের কোনো সম্পর্ক নেই বলে এগুলো অর্থনৈতিক কাজ নয়।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে; একটি হল বিনিময়বিহীন এবং অপরটি হল বিনিময়যোগ্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। মানুষের যেসব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিনিময়গেহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, তাকে বিনিময়বিহীন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বলে। যেমন, কৃষক নিজের বা পরিবারের ভোগের জন্য খাদ্যশস্য, তরিতরকারি ও ফলমূল উৎপাদন করে। এসব উৎপাদন বিনিময়বিহীন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।

প্রাচীনকালে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিনিময়বিহীন ছিল। সে সময়ে মানুষের প্রয়োজন ছিল সীমিত। সেজন্য তারা নিজের বা পরিবারের প্রয়োজনের জন্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করত। যেমন, কৃষক নিজের জমি নিজেই চাষ করে নিজের

বা পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় ফসল উৎপাদন করত। শিকারি পশু শিকার করে পশুর মাংস খেত এবং চামড়া পরিধান করত। সে সময়ে বিনিময় প্রথার উদ্ভব ঘটেনি। তাই সে সময়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে বিনিময়হীন ছিল।

আধুনিককালে বিনিময় প্রথা চালু আছে। কিন্তু বিনিময়হীন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অবসান ঘটেনি। কৃষি, পশুপালন, মৎস্য শিকার, গৃহবধূর গৃহস্থালি কাজ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিনিময়বিহীন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু আছে। বাংলাদেশের কৃষিতে দেখা যায়, কৃষকেরা জমিতে যে ফসল উৎপাদন করে তার একাংশ নিজের বা নিজ পরিবারের ভোগের জন্য রেখে দেয় এবং বাকি অংশ বাজারে বিক্রয় করে।

মানুষের যেসব অর্থনৈতিক কর্মের সঙ্গে বিনিময়ের সম্পর্ক আছে তাকে বিনিময়যোগ্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বলা হয়। মানুষের অভাব এখন সীমাহীন। প্রাচীন যুগের মতো মানুষ এখন আর স্বাবলম্বী বা আত্মনির্ভরশীল নয়। আধুনিক যুগের মানুষ এখন একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। কৃষক ফসল উৎপাদন করে কিন্তু সে পোশাক তৈরি করতে পারে না। দর্জি পোশাক তৈরি করে কিন্তু সে ফসল উৎপাদন করতে পারে না। কৃষক তার উৎপাদিত ফসলের একাংশের বিনিময়ে দর্জির নিকট থেকে পোশাক সংগ্রহ করে। আবার দর্জি তার কাজের বিনিময়ে কৃষকের নিকট থেকে ফসল সংগ্রহ করে। এভাবে দ্রব্য বিনিময় প্রথা চালু হয়। পরে অর্থের প্রচলনের ফলে বিনিময়ের পরিধি এবং বিনিময়যোগ্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিমাণ বেড়েছে। এখন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বৃহত্তম অংশ বিনিময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে পড়েছে।

### বাংলাদেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

বাংলাদেশের জনসাধারণের সর্বপ্রধান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হল কৃষিকাজ। বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত।

কৃষিকাজের অন্তর্ভুক্ত কাজকর্ম হল জমি চাষ, বীজবপন, পানিসেচ, সার ছিটানো, কীটনাশক ওষুধ ছিটানো, ফসল কাটা, ফসল বিক্রি করা ইত্যাদি। এ ছাড়াও রয়েছে পশুপালন, মাছ চাষ, মাছ ধরা, হাঁস-মুরগি প্রতিপালন এবং তরিতরকারি ও ফলমূল উৎপাদন।

কৃষি ছাড়া বাংলাদেশের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কাজ, বড় বড় শিল্প বা কলকারখানার কাজ, সরকারি ও বেসরকারি চাকুরি, রাস্তাঘাট ও রেললাইন নির্মাণ, যানবাহন চালনা, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি। খেলনা, পুতুল ও মিষ্টি তৈরি, দর্জি, কামার, কুমার, স্বর্ণকার, চর্মকার, তাঁতি, বিড়ি তৈরির কাজ প্রভৃতি কুটিরশিল্পের কাজ বলে গণ্য করা হয়। অনেকে আবার গ্রাম্য ডাক্তার, হকার, কাঠুরিয়া ও ফেরিওয়ালা হিসেবে কাজ করে বেঁচে থাকে।

সংক্ষেপে এগুলো হল বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. প্রাচীনকালে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল—

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| ক. মূলধনবিহীন    | খ. বিনিময়বিহীন |
| গ. বিনিয়োগবিহীন | ঘ. উপযোগবিহীন   |

২. বিনিময়যোগ্য—

- |                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| ক. গৃহবধূর গৃহস্থালি কাজ   | খ. পরিবারের ভোগের জন্য কৃষিকাজ |
| গ. শৌখিন মৎস্য শিকারের কাজ | ঘ. দর্জির পোশাক তৈরির কাজ      |

**নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।**

করিম একজন শিক্ষিত যুবক। সে সরকারি প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেদের পুকুরে মাছ চাষ শুরু করে। তার খামারে আরও দুইজন লোক কাজ করে। করিম নিয়মিত পুকুরে মাছের খাদ্য প্রয়োগ করে, পুকুরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করে। তাছাড়া সে পুকুরের পাড়ে বাগানও করে। বর্তমানে করিম একজন সফল মানুষ।

৩. করিমের পুকুরে মাছ চাষ কী ধরনের কাজ ?

ক. শখের কাজ

খ. ঝুঁকিপূর্ণ কাজ

গ. বিনিময়মূলক কাজ

ঘ. স্বকর্মসংস্থানমূলক কাজ

৪. করিমের উদাহরণ থেকে কী শিক্ষা নেওয়া যায় ?

i. মাছ চাষ করলে লাভবান হওয়া যায়

ii. নিজের কাজ করতে কোনো লজ্জা নেই

iii. চেষ্টায় মানুষ ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে

**নিচের কোনটি সঠিক ?**

ক. i

খ. ii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৫. বাংলাদেশের মানুষের প্রধান অর্থনৈতিক কাজ হচ্ছে—

ক. ব্যবসা-বাণিজ্য

খ. চাকরি

গ. পশুপালন

ঘ. কৃষিকাজ

**নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬ ও ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।**

রহমান সাহেব একজন শৌখিন মানুষ। তিনি বিনা বেতনে একটি কলেজে শিক্ষকতা করেন। তিনি প্রতিদিন সকালে তার বাগানে কাজ করেন, কলেজ থেকে ফিরে ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেলাধুলা করেন। বন্ধের দিন পুকুরে মাছ ধরেন এবং তা স্থানীয় বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করেন।

৬. রহমান সাহেবের বিনিময়বিহীন অর্থনৈতিক কাজ হল—

ক. পুকুরে মাছ ধরা

খ. কলেজে শিক্ষকতা করা

গ. বাগানে কাজ করা

ঘ. ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেলাধুলা করা

৭. রহমান সাহেবের বাগানের কাজ কেন অর্থনৈতিক কাজ ?

ক. এতে তিনি আনন্দ পান

খ. এ কাজে তাঁর কোনো অলসতা নেই

গ. বাগানে উৎপাদিত তরকারি ভোগ করেন

ঘ. বাগানে কাজ করা একটি শখের কাজ

**সৃজনশীল প্রশ্ন**

১. মাসুম সাহেব একজন স্কুলশিক্ষক। শ্রেণীতে পাঠদানকালে তিনি উল্লেখ করেন- জীবিকা সংগ্রহের জন্য ডা. কামাল হাসপাতালে চাকরি করেন। ছলিমউদ্দিন কৃষিকাজ করেন। আবার হাবুন করে চুরি-ডাকাতি এবং স্বপন করে খেলাধুলা। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের জবাবে মাসুম সাহেব বললেন যে, তার নিজের, ডা. কামালের এবং ছলিমউদ্দিনের কাজ অর্থনৈতিক কাজ, কিন্তু হাবুন এবং স্বপনের কাজ অর্থনৈতিক কাজ নয়। অর্থনৈতিক কাজের মাধ্যমে মানুষ নিজের এবং দেশের উন্নয়ন সাধন করে।

- ক. অর্থনৈতিক কাজ কী ?
- খ. মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা ব্যাখ্যা কর।
- গ. মাহুম সাহেব, ডা. কামাল এবং ছলিমউদ্দিনের কাজ অর্থনৈতিক কাজ কেন ?
- ঘ. অর্থনৈতিক কাজ কীভাবে দেশের উন্নয়ন সাধন করে, ব্যাখ্যা কর ?
২. মানুষের জীবনে অভাব অসীম কিন্তু সম্পদ সীমিত। তাই মানুষ জীবন ও জীবিকার তাগিদে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজকর্মে নিয়োজিত থাকে। এসব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন, জলিল সাহেব কৃষিকাজ করেন। তবে তিনি যে উৎপাদন করেন তা শুধুমাত্র তার পরিবারের খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্যই ব্যয় করেন। অপরদিকে করিম সাহেবের রয়েছে একটি তৈরী পোশাক শিল্প। এ শিল্পে উৎপাদিত পোশাক তিনি বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন।
- ক. জলিল সাহেব-এর কৃষিকাজ কী ধরনের অর্থনৈতিক কাজ ?
- খ. ওপরের ঘটনার আলোকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রকারভেদ বর্ণনা কর।
- গ. করিম সাহেবের কাজ দেশের অর্থনীতিতে কী ভূমিকা রাখতে পারে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. মানুষের সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা হল জীবিকা সংগ্রহের তাগিদ, ব্যাখ্যা কর।

## অষ্টম অধ্যায়

# অর্থনীতির দুইটি মৌল বিষয়: অভাব ও উপযোগ

অর্থনীতি আলোচনার জন্য কতকগুলো মৌল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এসব মৌল বিষয়ে ধারণা থাকলে অর্থনীতি পাঠ সহজ হয়। অর্থনীতির দুইটি মৌল বিষয়: অভাব ও উপযোগ অর্থনীতি আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

## অভাব

### অভাব কাকে বলে?

সাধারণভাবে কিছু পাওয়ার ইচ্ছা থেকে অভাবের উৎপত্তি। কোনো দ্রব্য পাওয়ার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা তাকে অভাব বলে। অর্থনীতিতে বস্তুগত বা অবস্তুগত যে কোনো জিনিস পাওয়ার জন্য মানুষের ইচ্ছাকে অভাব বলা হয়। কেউ হয়তো জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য, কেউ জীবনকে আরামপ্রদ করার জন্য, কেউবা বিলাসী জীবনযাপনের জন্য, আবার কেউবা সেবা পাওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে। এ জীবনধারণ, বিলাসব্যসন বা সেবাকাজ পাওয়ার জন্য আমাদের মনে যে আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয় অর্থনীতিতে তাকেই অভাব বলে।

মানুষ অভাব পূরণের জন্য অবিরত কাজ করে থাকে। কৃষকেরা মাঠে কাজ করে, শ্রমিকেরা কলকারখানায় কাজ করে, শিক্ষকেরা স্কুল-কলেজে শিক্ষাদান করে। মানুষের এসব কাজের পিছনে রয়েছে অভাববোধ ও অভাব পূরণের তাগিদ। একজন শ্রমিক কলকারখানায় পরিশ্রম করে যে মজুরি পায় সে চায় তার দ্বারা অভাব পূরণ করতে। এভাবে মানুষের সর্বকম অর্থনৈতিক কাজের মূল উদ্দেশ্য অভাব পূরণ করা।

### অভাবের বৈশিষ্ট্য

অভাবের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেগুলো নিচে বর্ণনা করা হল।

১। **অভাব সীমাহীন**: মানুষের অভাব সীমাহীন। একটি অভাব পূরণ হলে আর একটি অভাব দেখা দেয়। মানুষের আকাঙ্ক্ষার কোনো শেষ নেই। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব পূরণ হলে সে অনুভব করে আরামদায়ক ও বিলাসদ্রব্যের অভাব। এভাবে মানুষের জীবনে অসংখ্য অভাবের উদ্ভব হয়। আদিম মানুষের অভাব ছিল সীমাবদ্ধ। অল্পতেই তারা পরিতৃপ্ত থাকত। কিন্তু আধুনিক যুগের মানুষের অভাব সীমাহীন; অল্পতে তারা পরিতৃপ্ত হতে চায় না।

২। **বিশেষ অভাব পূরণ করা যায়**: সাধারণভাবে মানুষের অভাব সীমাহীন হলেও কোনো একটি নির্দিষ্ট দ্রব্যের জন্য অভাব সীমাবদ্ধ। যেমন, একজন কলা খেতে ভালোবাসে। তাকে যদি পরপর কয়েকটি কলা খেতে দেওয়া হয় তখন সে এমন অবস্থায় আসবে যখন তার কলা খাওয়ার ইচ্ছা আর থাকবে না। অর্থাৎ বিশেষ অভাব পূরণযোগ্য।

৩। **অভাব প্রতিযোগিতামূলক**: মানুষের অভাব অসীম কিন্তু অভাব পূরণের উপকরণ সীমাবদ্ধ। এজন্য মানুষের অসংখ্য অভাবের মধ্যে যেটি বেশি প্রয়োজনীয় অভাব তা পূরণ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে একটি অভাবের সঙ্গে অপরাপর অভাবের প্রতিযোগিতার প্রশ্ন আসে। এভাবে অপেক্ষাকৃত প্রয়োজনীয় অভাব প্রথমে পূরণ করা হয় এবং অনেক কম প্রয়োজনীয় অভাব অপূর্ণ থেকে যায়।

৪। **অভাব পরস্পরের বিকল্প**: মানুষের কোনো একটি অভাব একাধিক দ্রব্য দ্বারা পূরণ করা যায়। যেমন, দুধের সঙ্গে মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছা চিনি কিংবা গুড় দ্বারা পূরণ করা যায়। এ ক্ষেত্রে চিনি ও গুড় একে অপরের বিকল্প।

৫। **অভাব পরস্পরের পরিপূরক** : মানুষের কতকগুলো অভাব আছে যেগুলো একটি অন্যটির পরিপূরক অর্থাৎ একটি অভাব পূরণের জন্য একের অধিক দ্রব্যের প্রয়োজন পড়ে। যেমন, এক পেয়ালা চা পান করতে হলে চা পাতা, দুধ, চিনি প্রভৃতি দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। এখানে চা-পাতা, চিনি ও দুধ একে অন্যের পরিপূরক। এরকম কালি ও কলম, মোটরগাড়ি ও পেট্রোল পরস্পরের পরিপূরক। এসব অভাব একই সঙ্গে দেখা দেয় এবং একই সঙ্গে পূরণ করতে হয়।

### অভাবের শ্রেণীবিভাগ

মানুষের জীবনে অভাব অসংখ্য। মানুষ তার জীবনে যেসব দ্রব্যের অভাব অনুভব করে প্রকৃতি অনুসারে সেগুলোকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—

- ১ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব
- ২ আরামদায়ক দ্রব্যের অভাব
- ৩ বিলাসদ্রব্যের অভাব

১। **প্রয়োজনীয় দ্রব্য** : জীবনে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যেসব দ্রব্যের অভাব অনুভব করে এবং যেসব দ্রব্য ছাড়া মানুষ চলতে পারে না সেসব দ্রব্যকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বলা হয়। প্রয়োজনীয় দ্রব্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

- (ক) জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য
- (খ) দক্ষতার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য
- (গ) অভ্যাসজনিত প্রয়োজনীয় দ্রব্য

(ক) **জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য** : যেসব দ্রব্য মানুষের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য এবং যেগুলো ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকা কঠিন সেসব দ্রব্যকে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বলে। যেমন: বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, সাধারণ কাপড়চোপড় ও সাধারণ বাসগৃহের প্রয়োজন।

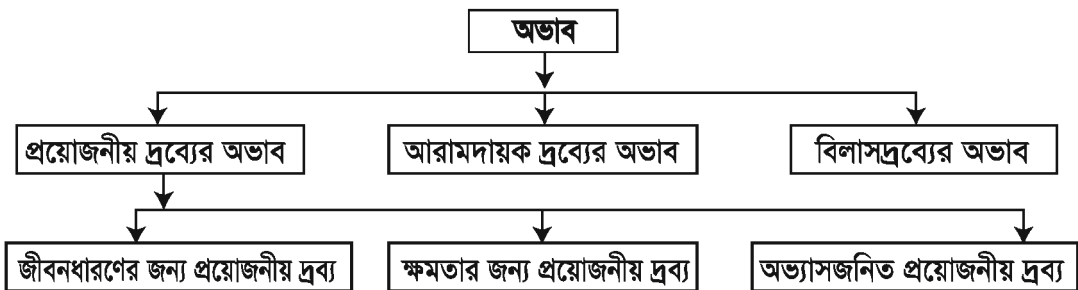
(খ) **দক্ষতার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য** : যেসব দ্রব্য ব্যবহার করলে মানুষের কর্মদক্ষতা বাড়ে সেসব দ্রব্যকে দক্ষতার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বলা হয়। যেমন: পুষ্তিকর খাদ্য, ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ, স্বাস্থ্যকর বাড়ি, চিকিৎসা, শিক্ষার ব্যবস্থা।

(গ) **অভ্যাসজনিত প্রয়োজনীয় দ্রব্য** : যেসব দ্রব্য মানুষ অভ্যাসবশত ব্যবহার করে থাকে সেসব দ্রব্যকে বলা হয় অভ্যাসজনিত প্রয়োজনীয় দ্রব্য। চা পান করা, প্রতি রাতে দুধ পান করে ঘুমোতে যাওয়া, ঘুমোনের আগে বই পড়া ইত্যাদি এর উদাহরণ। এসব দ্রব্য ব্যবহারে কেউ একবার অভ্যস্ত হয়ে পড়লে এগুলোর ব্যবহার ছাড়া চলতে তার অসুবিধা হতে পারে।

২। **আরামদায়ক দ্রব্য** : যেসব দ্রব্য ব্যবহার বা ভোগের ফলে মানুষের জীবন সহজ ও আরামদায়ক হয় সেসব দ্রব্যকে আরামদায়ক দ্রব্য বলা হয়। সুস্বাদু খাদ্য, ভালো বাড়ি, গাড়ি, বৈদ্যুতিক পাখা ইত্যাদি আরামদায়ক দ্রব্যের উদাহরণ।

৩। **বিলাস দ্রব্য** : যেসব দ্রব্য কম প্রয়োজনীয় কিন্তু বেশি মূল্যবান সেসব দ্রব্যকে বিলাসদ্রব্য বলা হয়। বিলাসদ্রব্য জাঁকজমক ও আভিজাত্য প্রদর্শনের জন্য ব্যবহার করা হয়। দামি গাড়ি, ব্যয়বহুল বাড়ি, হীরার আংটি, দামি পোশাক প্রভৃতি বিলাস দ্রব্যের উদাহরণ। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে বিলাসদ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার সমর্থন করা যায় না।

সহজে বোঝার জন্য নিচে অভাবের শ্রেণীবিভাগের একটি ছক দেওয়া হল।



## উপযোগ

### উপযোগ কাকে বলে?

সাধারণ কথায় উপযোগ বলতে কোনো জিনিস বা দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তাকে বোঝায়। কিন্তু অর্থনীতির ভাষায় কোনো জিনিস বা দ্রব্যের মানুষের অভাব পূরণ করার ক্ষমতাকে উপযোগ বলে। অর্থাৎ মানুষের অভাব পূরণ করার জন্য কোনো দ্রব্যের গুণ বা ক্ষমতা হল উপযোগ। যে দ্রব্যটি অভাব পূরণ করে তাকে কিন্তু উপযোগ বলা হয় না। দ্রব্যটির অভাব পূরণ করার ক্ষমতাকে উপযোগ বলা হয়। ক্ষুধা পেলে আমরা ভাত খাই। ভাত থেকে উপযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু ভাতকে উপযোগ বলা হয় না। ভাতের ক্ষুধা নিবারণ করার যে ক্ষমতা আছে সে ক্ষমতাই হল উপযোগ।

যেসব দ্রব্যের উপযোগ আছে মানুষ সেসব দ্রব্য পেয়ে তৃপ্তি লাভ করতে চায়। কিন্তু উপযোগ বিশিষ্ট সকল দ্রব্য মানুষ ইচ্ছা করলেই ভোগ করতে পারে না। কারণ মানুষের অভাব অনেক, কিন্তু অভাব পূরণের জন্য যে সম্পদের প্রয়োজন তা সীমিত। এজন্য প্রত্যেক মানুষ তার আয় ও বাজারে দ্রব্যের দাম বিবেচনা করে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে অভাব পূরণ করে এবং তা থেকে তৃপ্তি লাভ করে থাকে।

উপযোগ ধারণাটি বস্তুগত ও অবস্তুগত উভয় প্রকার দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোনো অবস্তুগত দ্রব্য মানুষের অভাব মেটাতে পারলে বুঝতে হবে তার উপযোগ আছে। যেমন, একজন শিক্ষকের শিক্ষাদান কার্য অবস্তুগত দ্রব্য। কাজেই শিক্ষকের শিক্ষাদানের উপযোগ রয়েছে। আবার, ভালো হোক বা মন্দ হোক, কোনো দ্রব্যের জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা থাকলে বুঝতে হবে তার কাছে ঐ দ্রব্যের উপযোগ আছে। বিড়ি, সিগারেট, তামাক প্রভৃতি ক্ষতিকর দ্রব্যেরও উপযোগ আছে। কারণ বিড়ি, সিগারেট ও তামাক ব্যবহারের কুফল থাকলেও এগুলো কোনো কোনো মানুষের অভাব মিটানোর ক্ষমতা রাখে।

কোনো দ্রব্যেরই নির্দিষ্ট কোনো উপযোগ নেই। এজন্য একই দ্রব্যের উপযোগিতা বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন, ধূমপানকারীর নিকট সিগারেটের উপযোগ আছে কিন্তু যিনি ধূমপান করেন না তার নিকট সিগারেটের কোনো উপযোগ নেই। আবার সময়ভেদে উপযোগে পার্থক্য ঘটে। যেমন, গরমের সময় ঠাণ্ডা পানির উপযোগ বেশি। আর ঠাণ্ডার সময় এর উপযোগ কম।

### মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের ধারণা

**মোট উপযোগ:** কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো একটি দ্রব্যের কতকগুলো একক ক্রয় করা হলে বিভিন্ন একক থেকে যে পরিমাণ উপযোগ পাওয়া যায় তার সমষ্টি বা যোগফলকে মোট উপযোগ বলা হয়। যেমন, কোনো একজন বালকের কমলালেবু খাওয়ার ইচ্ছা হল। সে ৪টি কমলালেবু ক্রয় করল। সে ১ম কমলালেবু থেকে ৬ টাকার সমান, ২য় কমলালেবু থেকে ৫ টাকার সমান, ৩য় কমলালেবু থেকে ৪ টাকার সমান এবং ৪র্থ কমলালেবু থেকে ৩ টাকার সমান উপযোগ পেল। এখানে মোট উপযোগ হল (৬+৫+৪+৩=১৮) টাকা অর্থাৎ ১৮ টাকার সমান।

**প্রান্তিক উপযোগ:** কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক ক্রয় করা হলে যে পরিমাণ অতিরিক্ত উপযোগ পাওয়া যায় তা হল প্রান্তিক উপযোগ। যেমন, ওপরের উদাহরণ থেকে পাওয়া যায় ১টি কমলালেবুর উপযোগ ৬ টাকার সমান এবং ২টির মোট উপযোগ ১১ টাকার সমান। এখানে দ্বিতীয় এককের প্রান্তিক উপযোগ হবে ৫ টাকার সমান। অনুরূপভাবে, ৩টি কমলালেবুর মোট উপযোগ ১৫ টাকার সমান।

এখানে তৃতীয় এককের প্রান্তিক উপযোগ হবে ৪ টাকার সমান। আবার ৪টি কমলালেবুর মোট উপযোগ হবে ১৮ টাকার সমান। এ ক্ষেত্রে চতুর্থ এককের প্রান্তিক উপযোগ হবে ৩ টাকার সমান। কমলালেবু ক্রয়ের ওপরের উদাহরণটি ডানপাশের তালিকায় দেখানো হল।

এ তালিকা থেকে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ আরও সহজভাবে বোঝা যাবে।

দ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণ	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
১টি	৬ টাকা	৬ টাকা
২টি	১১ টাকা	৫ টাকা
৩টি	১৫ টাকা	৪ টাকা
৪টি	১৮ টাকা	৩ টাকা

এখানে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, প্রতি একক কমলালেবু গ্রহণের পর কমলালেবুর মোট উপযোগ বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু কমলালেবুর প্রান্তিক উপযোগ আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১ ও ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

এই পৃথিবীতে মানুষের অভাব অসীম। কিন্তু অভাব পূরণের জন্য সম্পদের পরিমাণ সীমিত। অভাব মানুষের নিত্যসঙ্গী। অভাব পূরণ করতে গিয়ে মানুষকে কিছু না কিছু কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হয়।

১. মানব জীবনে সর্বপ্রথম অভাব হতে পারে—

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| ক. প্রয়োজনীয় দ্রব্যের | খ. আরামপ্রদ দ্রব্যের |
| গ. বিলাসজাত দ্রব্যের    | ঘ. শৌখিন দ্রব্যের    |

২. পূর্ণাঙ্গ অর্থে অভাব হল—

- ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাদ্যগ্রহণের ইচ্ছা
- বিলাসবহুল গাড়িতে চড়ার বাসনা
- কোনো দ্রব্য ও সেবাকর্ম পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |        |                |
|--------|----------------|
| ক. i   | খ. ii          |
| গ. iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের বাক্যগুলো পড়ে এবং তালিকা দেখে ৩, ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

রহিম স্কুল থেকে বাড়িতে এসে ৪টি আম কেটে খেল। তার আম ভোগ থেকে প্রাপ্ত উপযোগের হিসাব নিম্নরূপ :

আম ভোগের পরিমাণ	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
১টি	৫ টাকা	
২টি	৯ টাকা	
৩টি	১২ টাকা	
৪টি	১৪ টাকা	

৩. উপযোগ বলতে বোঝায়—

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ক. যে দ্রব্যটি অভাব পূরণ করে        | খ. কোনো দ্রব্য ভোগের আকাঙ্ক্ষা       |
| গ. কোনো দ্রব্যের অভাব পূরণের ক্ষমতা | ঘ. কোনো দ্রব্যের অন্তর্নিহিত গুণাগুণ |

৪. যখন আম ভোগের পরিমাণ ৪ তখন প্রান্তিক উপযোগ কত ?

- |      |      |
|------|------|
| ক. ২ | খ. ৩ |
| গ. ৪ | ঘ. ৫ |

৫. আম ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে মোট উপযোগ—

- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| ক. একটি নির্দিষ্ট হারে বাড়ে | খ. ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে |
| গ. ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে   | ঘ. সমানুপাতিক হারে বাড়ে  |





২. নাদিম ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। দুপুর বেলায় টিফিনে সে দোকানে গিয়ে পরপর ৪টি কলা খেল। নিচের সারণিতে নাদিম এর কলা ভোগ ও তা থেকে প্রাপ্ত উপযোগের হিসাব দেওয়া হল।

কলা ভোগের পরিমাণ	প্রাপ্ত মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
১টি	৫ টাকা	
২টি	৯ টাকা	
৩টি	১২ টাকা	
৪টি	১৪ টাকা	

- ক. উপযোগ কী ?
- খ. মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।
- গ. ওপরের সারণি থেকে প্রান্তিক উপযোগ নির্ণয় কর।
- ঘ. প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ-এর প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।
৩. হাসান ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। তার বাবা একজন দিনমজুর। তার আরও তিন ভাই লেখাপড়া করে। অতিকষ্টে তাদের দিন চলে। হাসান দেখল মানুষের জীবনে অভাবের কোনো শেষ নেই। কিন্তু সব অভাব পূরণ হয় না। যেমন তার বই, খাতা, স্কুলব্যাগ এবং একজোড়া কেড্‌স দরকার। কিন্তু প্রয়োজন বিবেচনা করে তার বাবা শুধুমাত্র বই এবং খাতা কিনে দিয়েছেন। অন্যান্য জিনিসগুলো ভবিষ্যতে কিনে দেবেন বলেছেন।
- ক. অভাব কী ?
- খ. শুধুমাত্র বই ও খাতা কিনে দেওয়ায় অভাবের যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
- গ. হাসানের মতো তুমি কীভাবে 'অভাবের শেষ নেই' ধারণাটি ব্যাখ্যা করবে?
- ঘ. হাসানের বাবা সবার সকল অভাব পূরণে কতটুকু সফল হতে পারেন ?

## নবম অধ্যায়

# মহাদেশ

### মহাদেশ কী?

ভূপৃষ্ঠের স্থলভাগ কয়েকটি বড় বড় খণ্ডে বিভক্ত। এরূপ এক একটি বড় খণ্ডকে মহাদেশ বলে। পৃথিবীর সমগ্র স্থলভাগকে এরূপ সাতটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। মহাদেশগুলো হল: এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, এন্টার্কটিকা ও অস্ট্রেলিয়া।

### মহাদেশসমূহের অবস্থান ও পরিচিতি

আয়তন অনুসারে মহাদেশগুলো বর্ণনা করা হল।

১। **এশিয়া মহাদেশ**: এশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ। এর আয়তন প্রায় ৪ কোটি ৬৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ২৩৭ বর্গকিলোমিটার। পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এ মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত। এশিয়া ১০° দক্ষিণ অক্ষরেখা থেকে ৮০° উত্তর অক্ষরেখা এবং ২৫° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা থেকে ১৭০° পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখা (১৮০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা অতিক্রম করে আরও ১০° দ্রাঘিমা) পর্যন্ত বিস্তৃত। এর উত্তরে উত্তর মহাসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে লোহিত সাগর ও আফ্রিকা এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর ও ইউরোপ মহাদেশ অবস্থিত। ইউরাল পর্বতমালা এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশের মাঝে অবস্থিত। জাপান, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ এ মহাদেশের অন্তর্গত।

২। **আফ্রিকা মহাদেশ**: আফ্রিকা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ। এর আয়তন প্রায় ৩ কোটি ২ লক্ষ ৯৮ হাজার ১০৭ বর্গকিলোমিটার। এ মহাদেশ ৩৭° উত্তর অক্ষরেখা থেকে প্রায় ৩৫° দক্ষিণ অক্ষরেখা এবং ১৭° পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখা থেকে ৫১° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। এর পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণে দক্ষিণ মহাসাগর, পূর্বে ভারত মহাসাগর ও লোহিত সাগর এবং উত্তরে ভূমধ্যসাগর অবস্থিত। ভূমধ্যসাগর আফ্রিকা মহাদেশকে ইউরোপ মহাদেশ থেকে পৃথক করেছে। এ মহাদেশের অন্তর্গত সর্ববৃহৎ দ্বীপ হল মাদাগাস্কার।

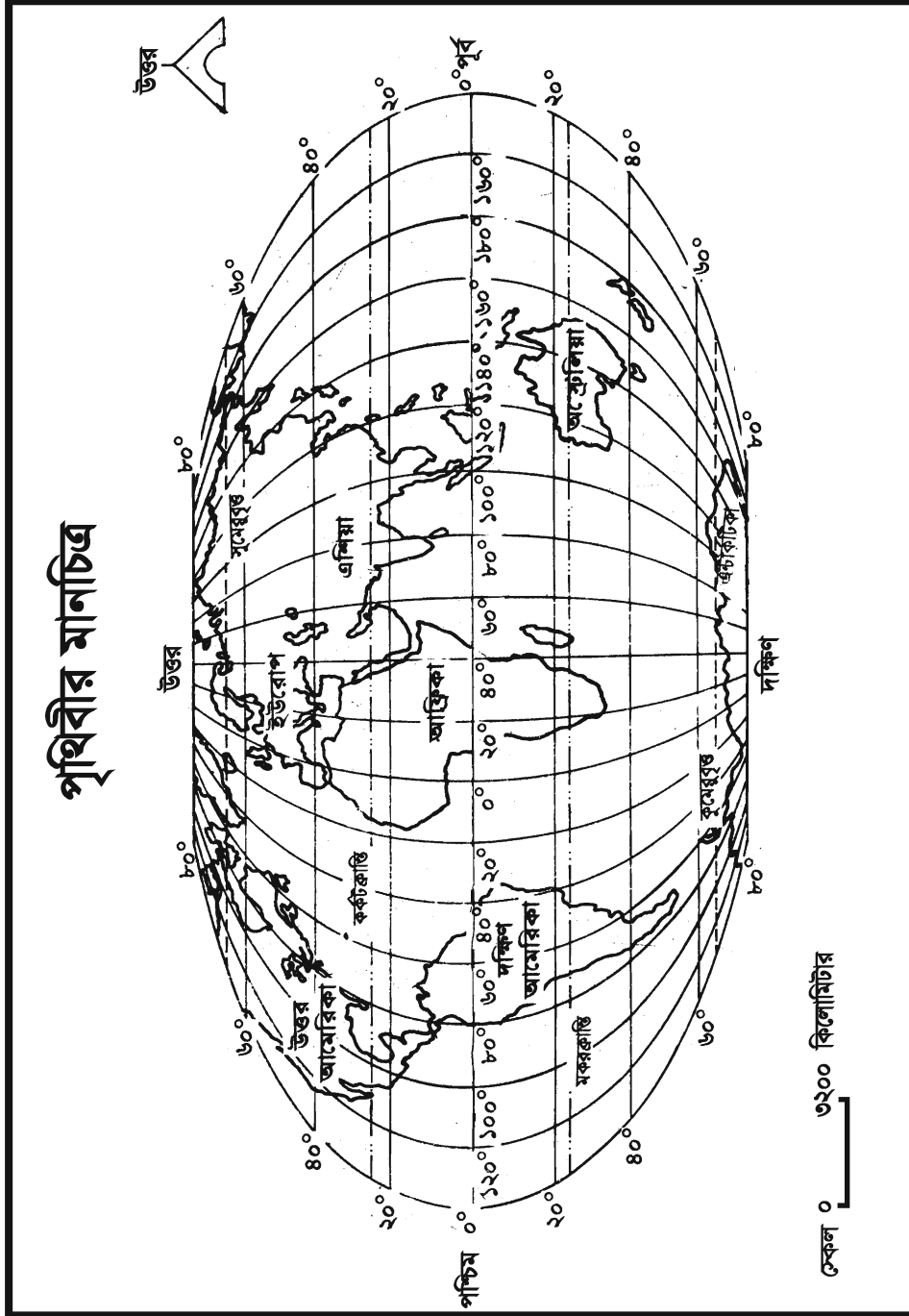
৩। **ইউরোপ মহাদেশ**: এশিয়া ও ইউরোপকে একত্রে ইউরেশিয়া বলা হয়। ইউরেশিয়ার পশ্চিমাংশের নাম ইউরোপ মহাদেশ। ইউরাল পর্বত, ইউরাল নদী, কাস্পিয়ান সাগর ও ককেশাস পর্বতশ্রেণী এশিয়া থেকে ইউরোপ মহাদেশকে পৃথক করেছে। এ মহাদেশ ৩৫° উত্তর অক্ষরেখা থেকে ৭১° উত্তর অক্ষরেখা এবং ২৫° পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখা থেকে ৬৬° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। ইউরোপের আয়তন প্রায় ২ কোটি ৩২ লক্ষ ২৭ হাজার ৪৯৬ বর্গ কিলোমিটার। এর উত্তরে উত্তর মহাসাগর, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণ সাগর, পূর্বে কাস্পিয়ান সাগর, ইউরাল নদী ও ইউরাল পর্বত অবস্থিত। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও আইসল্যান্ড দ্বীপ এ মহাদেশের অন্তর্গত।

৪। **উত্তর আমেরিকা মহাদেশ**: উত্তর আমেরিকা পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম মহাদেশ। এর আয়তন প্রায় ২ কোটি ২৩ লক্ষ ১৪ হাজার ২৩৯ বর্গকিলোমিটার। ত্রিভুজাকৃতি এ মহাদেশটি উত্তরে ৮৩° উত্তর অক্ষরেখা থেকে দক্ষিণে ৮° উত্তর অক্ষরেখা এবং পূর্বে ৫২° পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখা থেকে পশ্চিমে প্রায় ১৭০° পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। এর উত্তরে উত্তর মহাসাগর, দক্ষিণে দক্ষিণ আমেরিকা, পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগর ও পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর অবস্থিত।

পানামা খাল উত্তর আমেরিকাকে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। উত্তর আমেরিকার চারপাশে অবস্থিত বহু ছোটবড় দ্বীপ এ মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে উত্তর কানাডার সংলগ্ন দ্বীপসমূহ, গ্রিনল্যান্ড, নিউফাউন্ডল্যান্ড ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৫। **দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ**: ত্রিকোণাকার এ মহাদেশটি পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম মহাদেশ। এর আয়তন প্রায় ১ কোটি ৭৮ লক্ষ ৫৫ হাজার ১৫২ বর্গকিলোমিটার। এ মহাদেশটি উত্তরে ১৩° উত্তর অক্ষরেখা থেকে দক্ষিণে ৫৬° দক্ষিণ অক্ষরেখা এবং পূর্বে ৩৪° পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখা থেকে পশ্চিমে ৮২° পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে অবস্থিত।

এ মহাদেশের উত্তরে ক্যারিবিয়ান সাগর ও উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণে দক্ষিণ মহাসাগর, পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর ও পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগর অবস্থিত। এ মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে বহু ছোট ছোট দ্বীপ রয়েছে। এ ছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।



চিত্র ৯.১ : পৃথিবীর মানচিত্র

৬। এন্টার্কটিকা মহাদেশ: এন্টার্কটিকা মহাদেশ পৃথিবীর দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত। দক্ষিণ মেরুকে কেন্দ্র করে এন্টার্কটিকা মহাদেশ প্রায় বৃত্তাকারে অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ১ কোটি ৪১ লক্ষ বর্গকিলোমিটার\*। ৯০° দক্ষিণ মেরু থেকে ৬০° দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত এ মহাদেশ বিস্তৃত। দক্ষিণ মহাসাগর এ মহাদেশটিকে ঘিরে

উৎস: বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা শিট, ২০০৮

\*দি ওয়ার্ল্ড অ্যালাম্যানাক অ্যান্ড বুক অব ফ্যাক্টস, ১৯৯৯

রয়েছে। এটি সারা বছর বরফে ঢাকা থাকে এবং পৃথিবীর শীতলতম মহাদেশ। এর জলবায়ু জীবনধারণের অনুকূল নয়। এখানে মস ও শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ জন্মে। এ মহাদেশের প্রাণিকুলের মধ্যে সীল, পেঞ্জুইন ও অ্যালবাত্রিস পাখি অন্যতম।

৭। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ: অস্ট্রেলিয়া একটি দ্বীপ মহাদেশ। এটি পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাদেশ। এর সমগ্র অংশই নিরক্ষরেখার দক্ষিণে অবস্থিত। মহাদেশটি সমুদ্রবেষ্টিত। অস্ট্রেলিয়া, তাসমানিয়া ও নিউজিল্যান্ড ব্যতীত দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে আরও অনেক দ্বীপপুঞ্জ আছে। আঞ্চলিক অবস্থান অনুসারে এগুলোর বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। ম্যারিয়ানা, কেরোলিন, মার্শাল প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে মাইক্রোনেশিয়া গঠিত। ফিজি, নিউগিনি, বিসমার্ক, সান্তাক্রুজ, সলোমন, নিউ ক্যালিডোনিয়াসহ বহু দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ মেলেনেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। সামোয়া, টোঙ্গা, তওমোতু, ইস্টার, তাহিতি প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জকে পলিনেশিয়া বলে। সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ ওশেনিয়া নামে পরিচিত। ওশেনিয়ার আয়তন প্রায় ৮৫ লক্ষ ৬৪ হাজার ৩৩২ বর্গকিলোমিটার।

অস্ট্রেলিয়ার আয়তন প্রায় ৭৭ লক্ষ ৪১ হাজার ২২০ বর্গকিলোমিটার। এ মহাদেশটি  $10^\circ$  দক্ষিণ অক্ষরেখা থেকে  $80^\circ$  দক্ষিণ অক্ষরেখা এবং  $113^\circ$  পূর্ব দ্রাঘিমাংস থেকে  $158^\circ$  পূর্ব দ্রাঘিমাংস পর্যন্ত বিস্তৃত। অস্ট্রেলিয়ার পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর এবং উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে ভারত মহাসাগর অবস্থিত। এ মহাদেশের বিচিত্র প্রাণিকুলের মধ্যে ক্যাঙ্গারু, কোয়েলা, লায়ার, এমু, ডুগং অন্যতম।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- আয়তন অনুসারে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মহাদেশ কোনটি?  
ক. এশিয়া  
খ. ইউরোপ  
গ. আফ্রিকা  
ঘ. অস্ট্রেলিয়া
- উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের অংশ হচ্ছে—  
ক.  $0^\circ-11^\circ$  উত্তর অক্ষরেখা  
খ.  $0^\circ-12^\circ$  উত্তর অক্ষরেখা  
গ.  $0^\circ-13^\circ$  উত্তর অক্ষরেখা  
ঘ.  $0^\circ-18^\circ$  উত্তর অক্ষরেখা

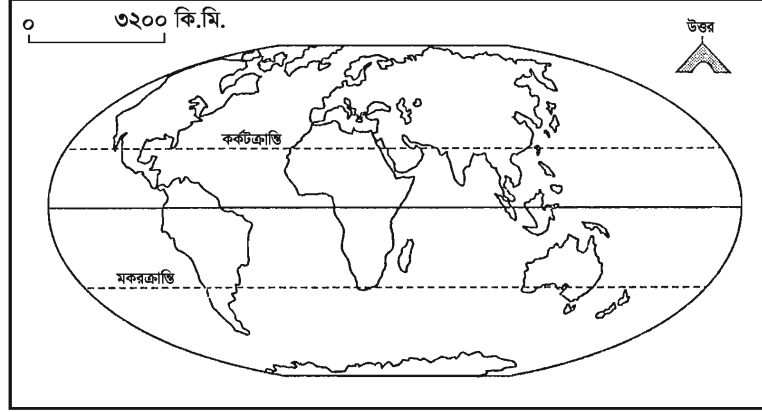
### নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

অস্ট্রেলিয়া একটি ক্ষুদ্র মহাদেশ। অনেকগুলো দ্বীপপুঞ্জ ও দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত এই মহাদেশ। মহাদেশটি দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত হলেও মহাসাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত।

- কোনটি অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের উল্লেখযোগ্য দ্বীপ ?  
ক. মাদাগাস্কার  
খ. আইসল্যান্ড  
গ. নিউফাউন্ডল্যান্ড  
ঘ. তাসমানিয়া
- এই মহাদেশ পরিবেষ্টিত—  
ক. প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগর দ্বারা  
খ. আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগর দ্বারা  
গ. প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগর দ্বারা  
ঘ. প্রশান্ত ও দক্ষিণ মহাসাগর দ্বারা
- এন্টার্কটিকা মহাদেশ জীবনধারণের অনুকূল নয়, কারণ—  
ক. জীবকুল বংশ বৃদ্ধি করতে অক্ষম  
খ. দক্ষিণ মেরুতে অবস্থিত বলে  
গ. প্রতিকূল জলবায়ুর কারণে  
ঘ. দক্ষিণ মহাসাগর পরিবেষ্টিত বলে
- নিম্নের কোন দ্বীপপুঞ্জগুলো এশিয়া, ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত ?  
ক. জাপান, ব্রিটিশ, ফকল্যান্ড  
খ. ফিলিপাইন, আইসল্যান্ড, গ্রিনল্যান্ড  
গ. ইন্দোনেশিয়া, নিউফাউন্ডল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড  
ঘ. মাদাগাস্কার, অস্ট্রেলিয়া, ম্যারিয়ানা

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিম্নের মানচিত্র ব্যবহার করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।



পৃথিবীর মানচিত্র

- ক. ওপরের মানচিত্রে কোন মহাদেশটি ত্রিভুজাকৃতি ?  
 খ. কেন এশিয়া ও ইউরোপকে একত্রে ইউরেশিয়া বলে? ব্যাখ্যা কর।  
 গ. ওপরের মানচিত্রের প্রতিরূপ একটি মানচিত্র অঙ্কন করে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ চিহ্নিত কর।  
 ঘ. এন্টার্কটিকা মহাদেশকে পৃথিবীর শীতলতম মহাদেশ বলার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

## দশম অধ্যায়

# এশিয়া মহাদেশ

**অবস্থান:** এশিয়া মহাদেশ পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধে অবস্থিত। এটি প্রায়  $10^{\circ}$  দক্ষিণ অক্ষরেখা থেকে  $80^{\circ}$  উত্তর অক্ষরেখা এবং  $25^{\circ}$  পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা থেকে  $190^{\circ}$  পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখা ( $180^{\circ}$  পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা অতিক্রম করে আরও  $10^{\circ}$  দ্রাঘিমা) পর্যন্ত বিস্তৃত। এর উত্তরে উত্তর মহাসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে লোহিত সাগর ও আফ্রিকা এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর ও ইউরোপ মহাদেশ অবস্থিত।

**আয়তন:** পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ এশিয়ার আয়তন প্রায় ৪ কোটি ৬৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ২৩৭ বর্গ কিলোমিটার। এটি পৃথিবীর মোট স্থলভাগের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।

**ভূপ্রকৃতি:** এশিয়া মহাদেশের ভূপ্রকৃতি বিশেষ বৈচিত্র্যময়। ভূপ্রকৃতি অনুসারে এশিয়া মহাদেশকে প্রধানত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

- ১। উত্তরের বিশাল নিম্ন সমভূমি
- ২। মধ্য এশিয়ার পার্বত্য উচ্চভূমি
- ৩। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকের নদীবিধৌত নিম্ন সমভূমি
- ৪। দক্ষিণাংশের মালভূমি
- ৫। পূর্বদিকের দ্বীপমালা অঞ্চল

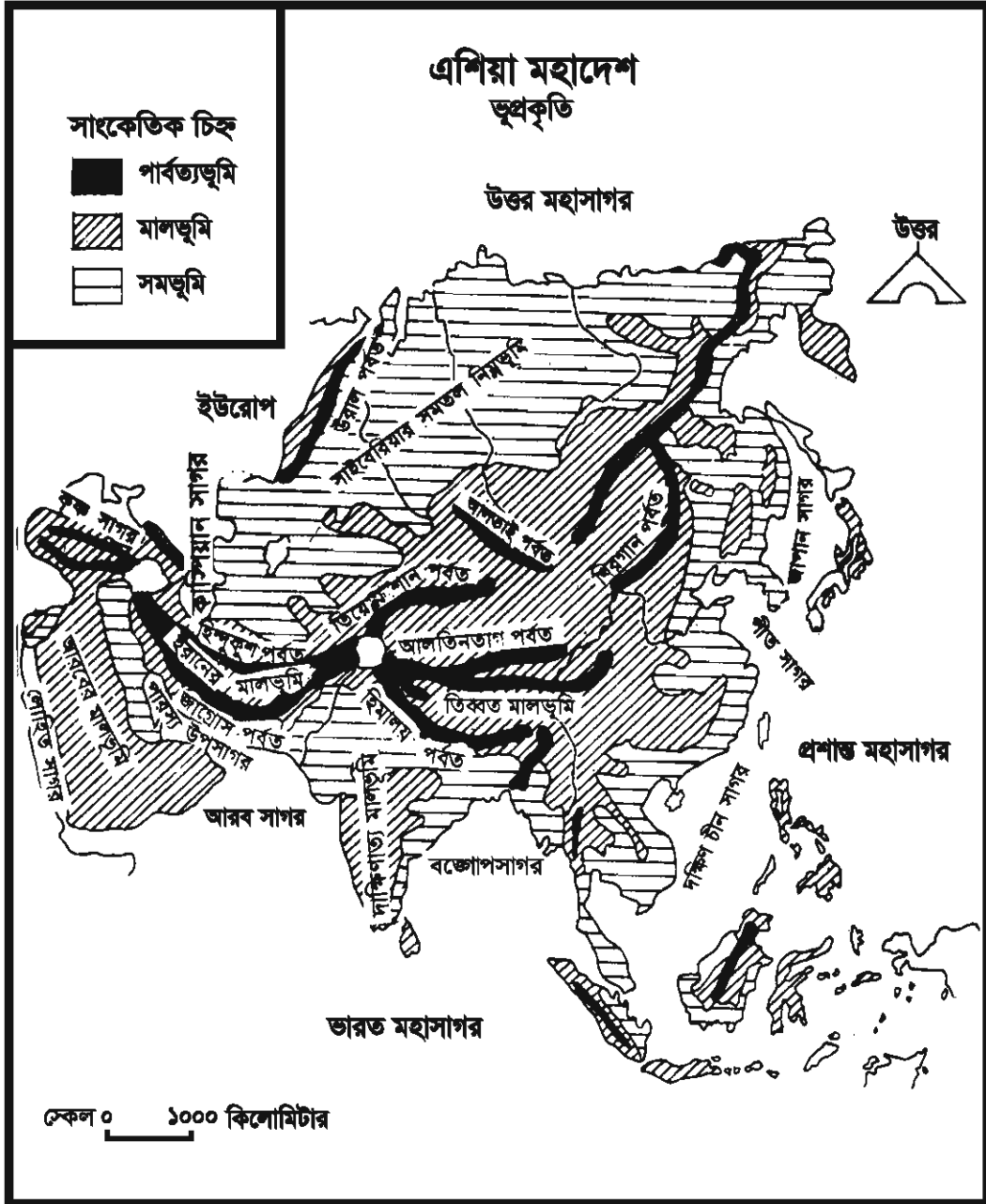
**১। উত্তরের বিশাল নিম্ন সমভূমি:** কাস্পিয়ান সাগর থেকে বেরিং প্রণালী পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় সমগ্র ভূভাগই এ অঞ্চলের অন্তর্গত। তুর্কিস্তানের নিম্ন সমভূমি, সাইবেরিয়ার সমভূমি ও কিরগিজ তৃণ সমভূমি এ অঞ্চলের অন্তর্গত। এ অঞ্চল এশিয়ার মধ্যভাগ থেকে উত্তর দিকে ক্রমশ ঢালু। ওব, ইনিসি, লেনা প্রভৃতি এ অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য নদী।

**২। মধ্য এশিয়ার পার্বত্য উচ্চভূমি:** উত্তরের নিম্ন সমভূমির দক্ষিণে এ বিশাল পার্বত্য অঞ্চলটি অবস্থিত। এ পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যভাগে পৃথিবীর সর্বোচ্চ মালভূমি পামীর অবস্থিত। এটি পৃথিবীর ছাদ নামে পরিচিত। পামীর গ্রন্থি থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কারাকোরাম ও হিমালয় পর্বত, উত্তর-পূর্ব দিকে তিয়েনশান পর্বতশ্রেণী, পূর্ব দিকে কুনলুন, উত্তর-পূর্বে আলতাই, দক্ষিণ-পশ্চিমে হিন্দুকুশ, সুলাইমান, ক্ষীরথর প্রভৃতি পর্বতশ্রেণী বিস্তৃত।

**৩। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকের নদীবিধৌত নিম্ন সমভূমি:** নদীবাহিত পলল দ্বারা গঠিত তাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস অববাহিকা, হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং অববাহিকা এবং সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা এ অঞ্চলের অন্তর্গত। এ অঞ্চলের মাটি খুবই উর্বর এবং জনবসতির ঘনত্ব অধিক।

**৪। দক্ষিণাংশের মালভূমি:** এশিয়ার দক্ষিণাংশে অবস্থিত আরব, দক্ষিণাত্য ও ইন্দোচীন মালভূমি এ অঞ্চলের অন্তর্গত। এ তিনটি মালভূমিই প্রাচীন শিলায় গঠিত এবং পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ক্রমশ ঢালু হয়ে বিস্তৃত হয়েছে।

**৫। পূর্ব দিকের দ্বীপমালা অঞ্চল:** এশিয়ার পূর্ব দিকে প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ফিলিপাইন, কালিমন্তান, সুমাত্রা, জাভা, সেলিবিস, জাপান প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ এ অঞ্চলের অন্তর্গত। এগুলোর অধিকাংশই আগ্নেয় পর্বতময়। এজন্য এসব দ্বীপ একযোগে ‘আগ্নেয়গিরি বলয়’ নামে পরিচিত।



চিত্র ১০.১ : এশিয়া মহাদেশের ভূপ্রকৃতি

## জলবায়ু

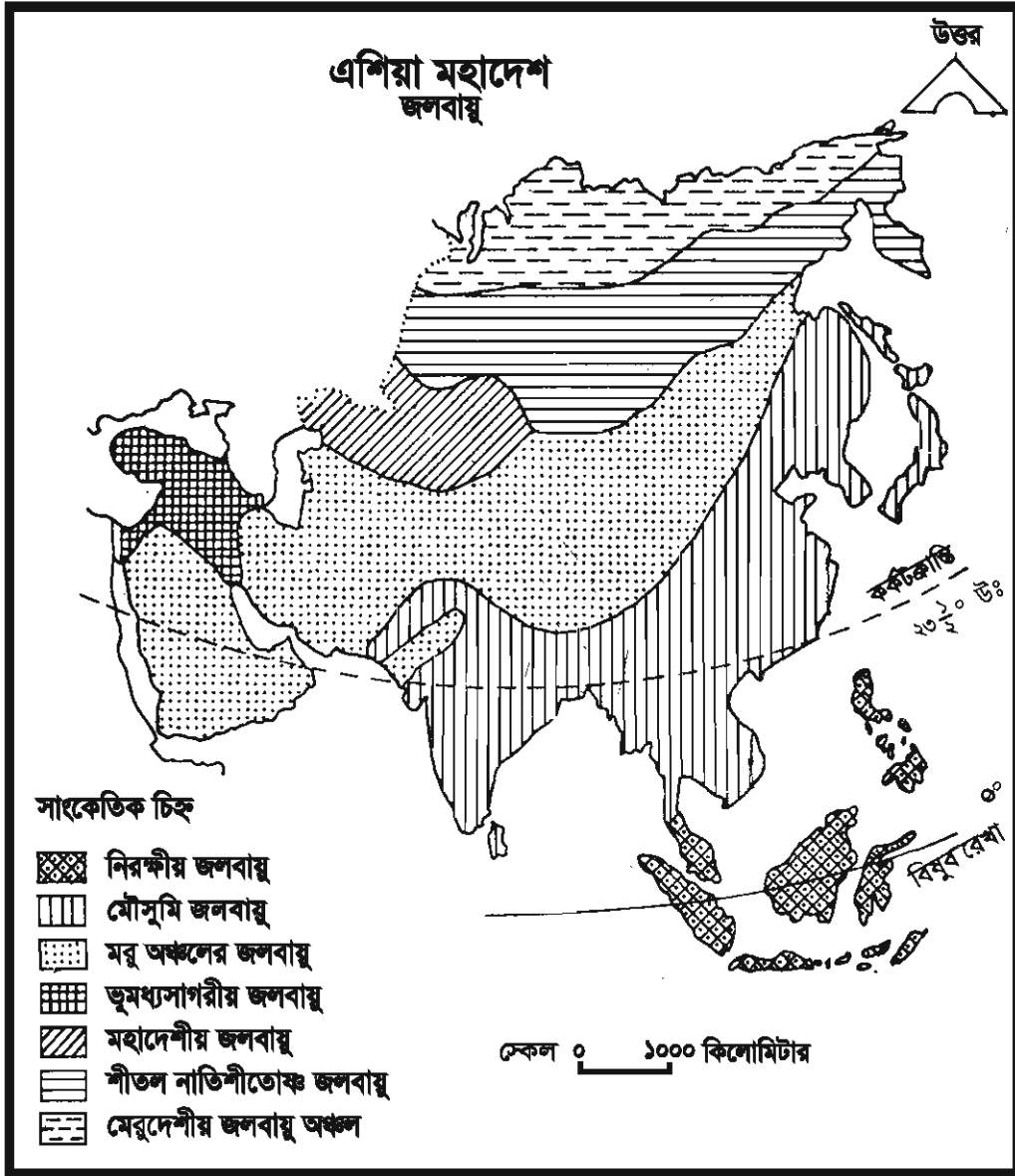
এশিয়া একটি বিশাল মহাদেশ। এটি নিরক্ষরেখার সামান্য দক্ষিণ থেকে উত্তরে মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই এশিয়ার দক্ষিণাংশ গ্রীষ্মমণ্ডলে, মধ্যাংশ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে এবং উত্তরাংশ হিমমণ্ডলে পড়েছে। অক্ষাংশ ছাড়াও উচ্চতা, জল ও স্থলভাগের অবস্থান, সমুদ্রস্রোত এবং বায়ুপ্রবাহও এ মহাদেশের জলবায়ুর ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এশিয়া মহাদেশে সর্বপ্রকার জলবায়ু দেখা যায়। জলবায়ুর পার্থক্য অনুসারে এশিয়া মহাদেশকে সাতটি জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। যথা :

১। নিরক্ষীয় জলবায়ু : নিরক্ষরেখা থেকে  $১০^\circ$  উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যে এ জলবায়ু দেখা যায়। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া এ জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত। সারা বছর অধিক তাপ ও বৃষ্টিপাত এ জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য।



২। মৌসুমি জলবায়ু: বৃষ্টিবহুল গ্রীষ্মকাল এবং প্রায় বৃষ্টিহীন শীতকাল মৌসুমি জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস, ফিলিপাইন এবং চীন ও জাপানের দক্ষিণাংশ প্রধানত মৌসুমি জলবায়ুর অন্তর্গত।

৩। মরু অঞ্চলের জলবায়ু: বৃষ্টিহীনতা ও উষ্ণতার পার্থক্যের জন্য মধ্য এশিয়ায় বিভিন্ন ধরনের মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে। গোবি মরুভূমি, আরব মরুভূমি, ইরানের মরুভূমি এবং ভারত ও পাকিস্তানের থর মরুভূমি এ জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত।



চিত্র ১০.২ : এশিয়া মহাদেশের জলবায়ু

৪। ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু: এশিয়ার তুরস্ক, সিরিয়া, লেবানন, ইসরাইল, জর্ডান, ইরাক ও ইরানের কিছু অংশ ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর অন্তর্গত। এ অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টি হয় কিন্তু গ্রীষ্মকালে সাধারণত বৃষ্টি হয় না।

৫। মহাদেশীয় জলবায়ু: পশ্চিম সাইবেরিয়ায় মহাদেশীয় চরমভাবাপন্ন জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়। শীতকালে শীতের প্রকোপ এবং তুষারপাত বেশি। ক্ষণস্থায়ী গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ও প্রায় বৃষ্টিহীন।

৬। শীতল নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু: সাইবেরিয়ার অধিকাংশ ভূখণ্ড এ অঞ্চলের অন্তর্গত। শীতকালে মেরু অঞ্চলের তীব্র

শীতল বায়ুর দরুন এখানে তুষারপাত হয় এবং প্রচণ্ড শীত পড়ে। পৃথিবীর শীতলতম স্থান ভারখয়ানস্ক এ জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত।

৭। **মেরুদেশীয় জলবায়ু**: সাইবেরিয়ার উত্তর উপকূলে মেরুদেশীয় জলবায়ু দেখা যায়। এ অঞ্চলে সারা বছরই গড় উত্তাপ হিমাক্ষের নিচে থাকে। প্রচণ্ড শীতে এ অঞ্চলে মৃত্তিকাস্থ পানি জমে কঠিন বরফে পরিণত হয়। এ অঞ্চলের জলবায়ুকে তুন্দ্রা অঞ্চলের জলবায়ুও বলা হয়।

## অধিবাসী ও জনসংখ্যা

**অধিবাসী**: এশিয়ার অধিবাসীকে প্রধান দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—পীত জাতীয় ও শ্বেত জাতীয়। উত্তর-পূর্বাংশে সাইবেরিয়া, জাপান, চীন, ইন্দোচীন ও মায়ানমারের অধিবাসীরা মঙ্গোলীয় বা পীত জাতীয় এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ার আরব, পাকিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধিবাসীরা ককেশীয় বা শ্বেত জাতীয়। দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদের দ্রাবিড় বলা হয়। দক্ষিণ ভারত, উত্তর শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশের মধ্যে মঙ্গোলীয়, ককেশীয় ও দ্রাবিড়দের সংমিশ্রণ রয়েছে। তবে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার অনেক স্থানে এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে কৃষ্ণকায় মালয় জাতি দেখা যায়।

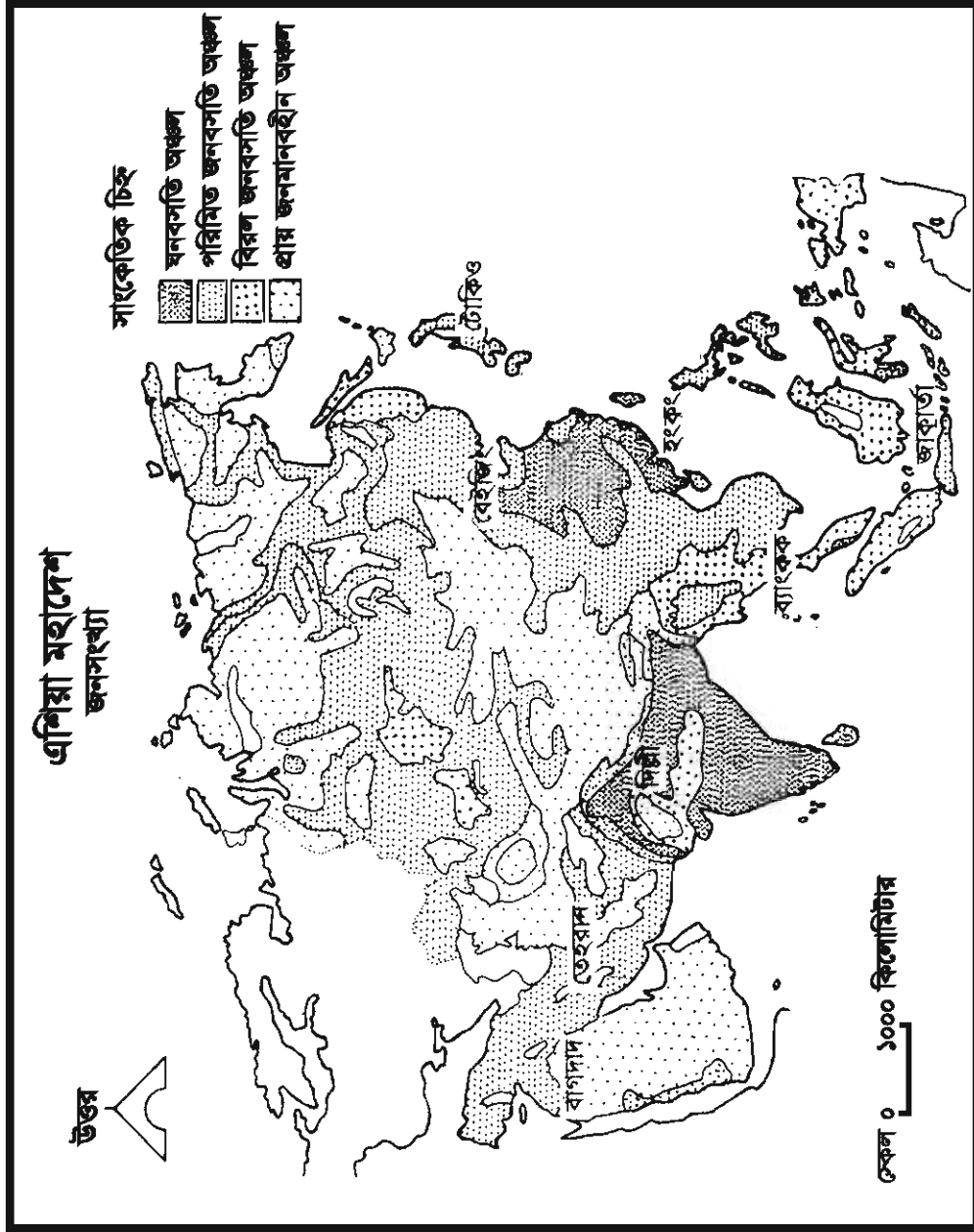
**জনসংখ্যা**: এশিয়া মহাদেশ কেবল আয়তনে নয়, জনসংখ্যার দিক দিয়েও পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ। পৃথিবীর শতকরা প্রায় ৬১ ভাগ লোক এ মহাদেশে বাস করে। ১৯৯৩ সালের হিসাব মতে, পৃথিবীর প্রায় ৫৫৪.৪ কোটি লোকের মধ্যে প্রায় ৩৩৫ কোটি লোক একমাত্র এ মহাদেশেই বাস করেছিল। ২০০৩ সালের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় ৬৩১.৪০ কোটি এবং মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৮৩ কোটি লোক একমাত্র এশিয়া মহাদেশে বাস করে (উৎস: বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা শিট, ২০০৩)। কিন্তু এশিয়ার সর্বত্র জনবসতি সমভাবে গড়ে ওঠেনি। কোনো অঞ্চলে জনবসতি খুবই ঘন, আবার কোনো অঞ্চলে বিরল জনবসতি, আবার কোথাও জনমানবহীন অঞ্চল। অবস্থান, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক সম্পদ (মৃত্তিকা, খনিজ, উদ্ভিজ্জ ইত্যাদি) এশিয়ার জনসংখ্যা বণ্টনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। নিম্নে অঞ্চলভেদে এশিয়ার জনবসতির বণ্টন আলোচনা করা হল।

১। **ঘনবসতি অঞ্চল**: এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব ভাগে জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। এ অংশে গড়ে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০০ জনের অধিক লোক বসবাস করে। তবে কোনো কোনো স্থানে জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১,০০০ জনেরও অধিক। এ অঞ্চলের নিম্ন সমতল ভূমির মৃত্তিকা খুবই উর্বর এবং মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাবে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলে কৃষিকার্যে খুবই সহায়ক। ফলে এ অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন প্রভৃতি এ অঞ্চলের অন্তর্গত।

২। **পরিমিত জনবসতি অঞ্চল**: এশিয়ার যেসব অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০ থেকে ১০০ জন সেসব অঞ্চল এর অন্তর্গত। এশিয়ার পশ্চিমাংশে অবস্থিত ইরান, ইরাক, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, তুরস্ক, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। অনূর্বর মৃত্তিকা ও চরমভাবাপন্ন জলবায়ুর জন্য এ অঞ্চল কৃষিকার্যে অনুন্নত এবং জনবসতির ঘনত্ব কম।

৩। **বিরল জনবসতি অঞ্চল**: এশিয়ার এ অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০ জনের কম। অনূর্বর মৃত্তিকা, বন্য প্রকৃতি ও প্রতিকূল জলবায়ুর জন্য এ অঞ্চলে জনবসতি বিরল। এশিয়ার বিভিন্ন পর্বত ও মালভূমি এ অঞ্চলের অন্তর্গত।

৪। **প্রায় জনমানবহীন অঞ্চল**: সাইবেরিয়ার শীতল মেরু অঞ্চল, আরব, গোবি, মঙ্গোলিয়া ও তিব্বতের মেরু অঞ্চল, হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল জনমানবহীন বসতি অঞ্চলের অন্তর্গত। এসব স্থানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১ জনেরও কম লোক বাস করে। জীবিকা অর্জন কষ্টসাধ্য, যাতায়াতে অসুবিধা, অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু প্রভৃতির জন্য এশিয়ার এসব অঞ্চল প্রায় জনমানবহীন।



চিত্র ১০.৩ : এশিয়া মহাদেশের জনসংখ্যা

### সম্পদ

মানুষের অভাব মিটানোর জন্য প্রকৃতি থেকে যা সংগ্রহ বা উৎপাদন করা হয় তার নামই সম্পদ। কৃষিজ দ্রব্য, বনজ দ্রব্য, খনিজ দ্রব্য, শিল্পজাত দ্রব্য এবং সমুদ্রজাত দ্রব্য ইত্যাদি সবই সম্পদ।

**কৃষিজ সম্পদ:** কৃষিকার্যই এশিয়ার অর্থনীতির মূল মেবুদড। এ মহাদেশের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ লোক কৃষিকার্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এর বিস্তীর্ণ সমভূমিগুলোতে, বিশেষ করে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উর্বর মৃত্তিকাসম্পন্ন নদী উপত্যকা ও বদ্বীপ অঞ্চলসমূহে ব্যাপকভাবে কৃষিকার্য করা হয়।

উৎপাদিত ফসলকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—(ক) খাদ্যশস্য ও (খ) অর্থকরী ফসল।

#### (ক) খাদ্যশস্য

এশিয়ার খাদ্যশস্যের মধ্যে ধান, গম, ভুট্টা, নারকেল, মশলা ইত্যাদি প্রধান।

**ধান :** ধান উৎপাদনে এশিয়া মহাদেশ শীর্ষস্থানীয়। পৃথিবীর শতকরা প্রায় ৯১ ভাগ ধান একমাত্র এশিয়া মহাদেশেই উৎপন্ন হয়। এর উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু এবং উর্বর পলিযুক্ত মাটি ধান চাষের পক্ষে অনুকূল। চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, মায়ানমার ও ফিলিপাইনে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। ধান উৎপাদনে চীন বিশ্বে প্রথম, ভারত দ্বিতীয়, ইন্দোনেশিয়া তৃতীয় এবং বাংলাদেশ চতুর্থ।

**গম :** গম উৎপাদনে বর্তমানে এশিয়া বিশ্বে প্রথম। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু গম চাষের উপযোগী। চীন, ভারত, রাশিয়ার সাইবেরিয়া, তুরস্ক, পাকিস্তান ও কাজাকিস্তান গম উৎপাদনে প্রসিদ্ধ।

**ভুট্টা :** চীন, ভারত, পাকিস্তান ও ফিলিপাইনে ভুট্টা উৎপন্ন হয়।

**নারকেল :** শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, ভারত, বাংলাদেশ, ফিলিপাইন, কম্বোডিয়া ও মালয়েশিয়ার সমুদ্র তীরবর্তী উষ্ণ অঞ্চলে প্রচুর নারকেল উৎপন্ন হয়।

**মশলা :** শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ভারতে প্রচুর মশলা উৎপন্ন হয়।

### (খ) অর্থকরী ফসল

এশিয়ার অর্থকরী ফসলের মধ্যে পাট, তুলা, রবার, চা, তামাক ইত্যাদি প্রধান।

**পাট :** উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু এবং নদীবিধৌত পলিমাটি দ্বারা গঠিত জমিতে পাট ভালো জন্মে। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বেশি পাট বাংলাদেশ ও ভারতে উৎপন্ন হয়। এ ছাড়া চীন, থাইল্যান্ড, মায়ানমার ও ভিয়েতনামেও সামান্য পাট জন্মে।

**তুলা :** চীন, ভারত, পাকিস্তান ও উজবেকিস্তানে উন্নতমানের তুলা উৎপন্ন হয়। তুলা উৎপাদনে চীন বিশ্বে প্রথম।

**রবার :** রবার নিরক্ষীয় অঞ্চলের বৃক্ষ। এ কারণে ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ভারত, চীন ও ফিলিপাইন রবার-চাষে প্রসিদ্ধ। বর্তমানে বাংলাদেশেও রবারের চাষ হয়।

**চা :** পৃথিবীর মোট উৎপাদিত চা এর শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ এশিয়া মহাদেশেই উৎপন্ন হয়। চা উৎপাদনে বিশ্বে ভারত প্রথম, চীন দ্বিতীয় এবং শ্রীলঙ্কা তৃতীয়। এ ছাড়া ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, জাপান এবং বাংলাদেশেও প্রচুর চা উৎপন্ন হয়।

**তামাক :** চীন, ভারত, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, জাপান ও আজারবাইজানে প্রচুর তামাক জন্মে। তবে এদের মধ্যে চীন বিশ্বে প্রথম এবং ভারত চতুর্থ। বাংলাদেশেও তামাক উৎপন্ন হয়।

**অন্যান্য :** অন্যান্য অর্থকরী ফসলের মধ্যে কফি, আখ, রেশম ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

### বনজ সম্পদ

এশিয়া মহাদেশ বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। নিরক্ষীয় অঞ্চলের চিরহরিৎ নিবিড় বনভূমিতে শাল, সেগুন, মেহগনি, আবলুস, রবার, তাল, বাঁশ প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষ জন্মে। এ ছাড়া ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু বিশিষ্ট অঞ্চলে কর্ক, ওক, মিষ্টি বাদাম, আপেল, কমলালেবু প্রভৃতি বৃক্ষও জন্মে। তদুপরি মৌসুমি অঞ্চলে পাতাঝরা চিরহরিৎ বৃক্ষের বন, সাইবেরিয়া অঞ্চলে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি, তুন্দ্রা অঞ্চলে মস ও শেওলার আচ্ছাদন দেখা যায়।

### খনিজ সম্পদ

এশিয়া মহাদেশ খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ। চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও জাপানে সর্বাধিক খনিজ সম্পদ আহরণ করা হয়।

**কয়লা :** চীন, ভারত, কাজাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ও জাপানে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। তবে কয়লা উৎপাদনে চীন বিশ্বে প্রথম এবং ভারত তৃতীয়।

**খনিজ তেল:** সৌদি আরব, ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, চীন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ খনিজ তেল উত্তোলনে প্রসিদ্ধ। এদের মধ্যে সৌদি আরব বিশ্বে প্রথম।

**প্রাকৃতিক গ্যাস:** উজবেকিস্তান, কাজাকিস্তান, পাকিস্তান, সৌদি আরব, ইরান, ইরাক, চীন, ইন্দোনেশিয়া, মায়ানমার ও বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলিত হয়।

**তামা:** এশিয়ায় ফিলিপাইন, চীন, ভারত ও জাপানে তামা পাওয়া যায়।

**টিন:** ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, জাপান ও চীনে টিন পাওয়া যায়। টিন উৎপাদনে ইন্দোনেশিয়া বিশ্বে প্রথম।

**সোনা:** চীন, ফিলিপাইন, জাপান, ভারত, মায়ানমার ও কোরিয়ায় সোনা পাওয়া যায়।

**অন্যান্য খনিজ সম্পদ:** রূপা, অত্র, ম্যাংগানিজ প্রভৃতি খনিজদ্রব্যও এশিয়ায় প্রচুর পাওয়া যায়। অত্র ও ম্যাংগানিজ উৎপাদনে ভারত বিশ্বে প্রসিদ্ধ।

### মৎস্য সম্পদ

এ মহাদেশে প্রচুর মৎস্য সম্পদ রয়েছে। এর অভ্যন্তরীণ নদী, খালবিল, পুকুর প্রভৃতি থেকে প্রচুর মৎস্য ধরা হয়। সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে এ মহাদেশের পূর্ব দিকের উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল পৃথিবীতে প্রথম। এখানকার প্রধান কেন্দ্র হল জাপানের চারদিকের অগভীর সমুদ্র। এখানে কড, হেরিং, স্যামন প্রভৃতি মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ভূমধ্যসাগর এবং উত্তর সাগরে তিমি, সীল প্রভৃতি মাছ পাওয়া যায়। আবার বিভিন্ন সমুদ্র থেকে প্রচুর মুক্তা, ঝিনুক, প্রবাল প্রভৃতিও আহরণ করা হয়।

### শিল্প সম্পদ

প্রাচীনকালে এশিয়া মহাদেশ চারু ও কারুশিল্পের জন্য বিশ্বে প্রসিদ্ধ ছিল। তখন এশিয়ার উন্নতমানের কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যাদি অন্যান্য মহাদেশে রপ্তানি হত। বর্তমানে এ মহাদেশের জাপান, চীন, ভারত, পাকিস্তান, ইরান, তুরস্ক, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশ শিল্পে যথেষ্ট উন্নত।

লোহা ও ইস্পাত উৎপাদনে বিশ্বে জাপান দ্বিতীয়, চীন চতুর্থ এবং ভারত একাদশ। বস্ত্র উৎপাদনে চীন বিশ্বে প্রথম, ভারত দ্বিতীয় এবং জাপান পঞ্চম। ইরান, তুরস্ক, পাকিস্তান, জাপান ও চীন পশমশিল্পে প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া কাগজ ও পাটশিল্পেও এ মহাদেশ উন্নত। পাটশিল্পে বাংলাদেশ ও ভারত বিশ্বে প্রসিদ্ধ।

### প্রধান শহর ও বন্দর

১। **সাংহাই:** ইয়াংসিকিয়াং নদীর মোহনায় অবস্থিত সাংহাই চীনের সর্বপ্রধান শহর, বন্দর ও শিল্প কেন্দ্র।

২। **বেইজিং:** বেইজিং চীনের রাজধানী, প্রধান বাণিজ্য ও শিল্প কেন্দ্র।

৩। **টোকিও:** জাপানের রাজধানী টোকিও এশিয়ার প্রধান ও পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর।

৪। **ইয়োকোহামা:** এটি জাপানের সর্বপ্রধান বন্দর। এ দেশের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বাণিজ্য এ বন্দরের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এর পোতাশ্রয় গভীর ও স্বাভাবিক।

৫। **ওসাকা:** জাপানের একটি ব্যস্ত শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। জাপানের অন্যতম প্রধান বন্দর। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে এখানে অনেক বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

৬। **ইয়াংগুন:** ইরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত ইয়াংগুন শহর মায়ানমারের রাজধানী, প্রধান বন্দর ও বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র।

৭। **সিঙ্গাপুর:** এটি সিঙ্গাপুরের প্রধান বন্দর, বাণিজ্যকেন্দ্র ও প্রসিদ্ধ পর্যটন কেন্দ্র। এর পোতাশ্রয় অত্যন্ত গভীর। এখানে উন্নতমানের জাহাজ তৈরির কারখানা আছে।

৮। **কলম্বো:** কলম্বো শ্রীলঙ্কার রাজধানী ও বিখ্যাত সমুদ্রবন্দর।

- ৯। **কলকাতা**: ভারতের বৃহত্তম নগর ও বন্দর। এটি হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত।
- ১০। **মুম্বাই**: ভারতের অন্যতম প্রধান বন্দর ও শহর।
- ১১। **নয়াদিল্লী**: যমুনার তীরে অবস্থিত নয়াদিল্লি ভারতের রাজধানী এবং উত্তর ভারতের সবচেয়ে বড় শহর।
- ১২। **করাচী**: করাচি পাকিস্তানের সাবেক রাজধানী, প্রধান শহর ও একমাত্র সমুদ্রবন্দর। এটি আরব সাগরের তীরে অবস্থিত।
- ১৩। **ঢাকা**: বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী এবং একটি শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র।
- ১৪। **চট্টগ্রাম**: কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত চট্টগ্রাম বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর, বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র ও দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর।
- ১৫। **মক্কা ও মদিনা**: মক্কা ও মদিনা মুসলমানদের পবিত্র হজ্জ ও জিয়ারত স্থান। মক্কা হযরত মুহম্মদ (স)-এর জন্মস্থান এবং মদিনায় তাঁর পবিত্র রওজা মোবারক অবস্থিত।
- ১৬। **ম্যানিলা**: এটি ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী ও প্রধান বন্দর।
- ১৭। **সায়গন**: এটি ভিয়েতনামের প্রধান বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র।
- ১৮। **বৈরুত**: এটি লেবাননের রাজধানী ও প্রধান বন্দর।
- ১৯। **এডেন**: এডেন উপসাগরের তীরে অবস্থিত এ বন্দরটি ইয়েমেনের অন্যতম প্রধান শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিম্নের কোন দেশগুলো মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত ?
- |                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| ক. বাংলাদেশ, জর্ডান, চীন | খ. বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন |
| গ. বাংলাদেশ, লাওস, ইরাক  | ঘ. বাংলাদেশ, জাপান, ইরান         |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২, ৩, ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

এশিয়া মহাদেশের জনবসতি সমভাবে গড়ে ওঠেনি। কোনো অঞ্চলে জনবসতি খুবই কম। আবার কোনো অঞ্চলে খুবই বেশি। জনসংখ্যার বণ্টনের ওপর ভিত্তি করে এশিয়া মহাদেশকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

২. এশিয়া মহাদেশে কয়টি জনবসতি অঞ্চল রয়েছে ?
- |        |        |
|--------|--------|
| ক. ২টি | খ. ৩টি |
| গ. ৪টি | ঘ. ৫টি |
৩. নিম্নের কোন জনবসতি অঞ্চলে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০ থেকে ১০০ জন লোক বাস করে ?
- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| ক. বিরল জনবসতি   | খ. ঘনবসতি           |
| গ. পরিমিত জনবসতি | ঘ. প্রায় জনমানবহীন |
৪. পরিমিত জনবসতি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ—
- মঙ্গোলিয়া, ইরাক, ভারত
  - ইরান, ইরাক, বাংলাদেশ
  - ইরান, ইরাক, সৌদি আরব

## নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i  
গ. iii  
খ. ii  
ঘ. i, ii ও iii

৫. বিরল জনবসতি অঞ্চলের লোকসংখ্যা কম হওয়ার কারণ-

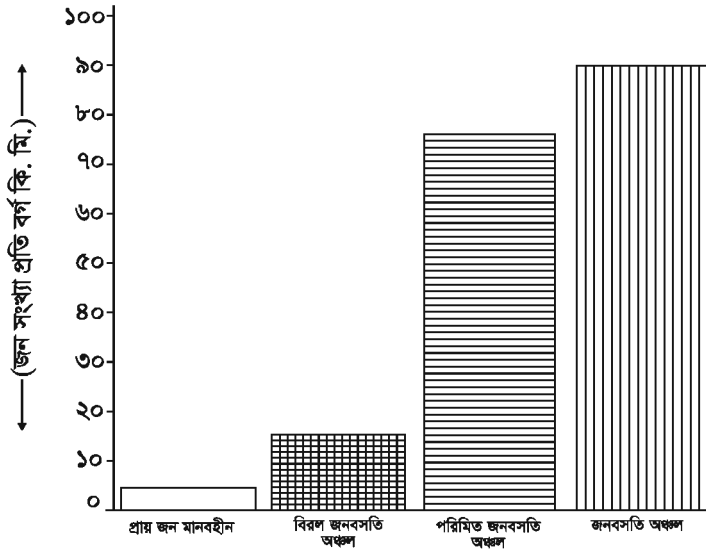
- ক. কম মাথাপিছু আয়  
গ. নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব  
খ. বন্যপ্রাণী ভূপ্রকৃতি  
ঘ. জীবিকার অপ্রতুলতা

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আহনাফ অস্ট্রেলিয়ায় লেখাপড়া করে বাংলাদেশে ফিরেছে। এর কিছুদিন পর শীতের মৌসুমে তার এক অস্ট্রেলিয়ান বন্ধু বাংলাদেশে বেড়াতে আসে। অস্ট্রেলিয়ান বন্ধু এদেশের আবহাওয়া সম্পর্কে জানতে চায় এবং প্রসঙ্গক্রমে সে এশিয়া মহাদেশের জলবায়ু সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে পড়ে।

- ক. বাংলাদেশ কোন মহাদেশের অন্তর্গত ?  
খ. বায়ুপ্রবাহ এবং সমুদ্রস্রোত কীভাবে এশিয়া মহাদেশের জলবায়ুতে প্রভাব বিস্তার করে? ব্যাখ্যা কর।  
গ. এশিয়া মহাদেশের ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, সিরিয়া, লেবানন কোন কোন জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত তার একটি তালিকা তৈরি কর।  
ঘ. 'এশিয়া মহাদেশে সর্বপ্রকার জলবায়ু দেখা যায়'-এ সম্পর্কে তোমার যুক্তি দাও।

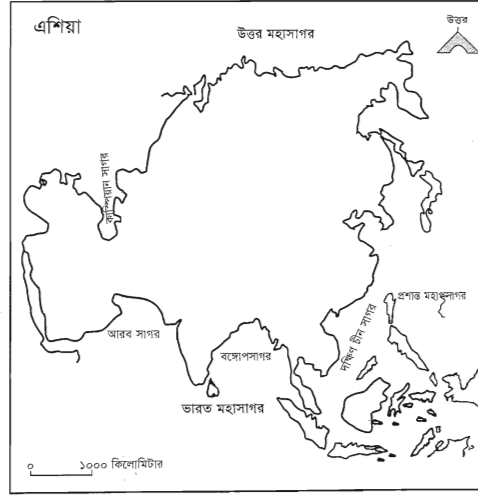
২. স্তম্ভ লেখচিত্রটি ব্যবহার করে নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।



চিত্র: এশিয়া মহাদেশের জনসংখ্যা

- ক. উপরিউক্ত স্তম্ভ লেখচিত্রটিতে কী দেখানো হয়েছে ?  
খ. জনবসতির বণ্টনভেদে এশিয়া মহাদেশে যে-কয়টি অঞ্চলে বিভক্ত তার একটি বর্ণনা দাও।  
গ. এশিয়া মহাদেশের কোন জনবসতি অঞ্চলে প্রতি বর্গকিলোমিটারে কতজন করে লোকের বাস তা ওপরের স্তম্ভ লেখচিত্র দেখে বর্ণনা দাও।  
ঘ. এশিয়া মহাদেশের জনবসতি অঞ্চল এবং প্রায় জনমানবহীন অঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যার ব্যাপক পার্থক্যের কারণগুলো যুক্তি সহকারে লেখো।

৩. প্রদত্ত মানচিত্র থেকে নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।



চিত্র : এশিয়া মহাদেশের ভূপ্রকৃতি

- ক. এশিয়ার উত্তরে কোন মহাসাগর অবস্থিত ?
- খ. পামীর মালভূমিকে কেন পৃথিবীর ছাদ বলে? ব্যাখ্যা কর।
- গ. ওপরের মানচিত্রের অনুরূপ একটি মানচিত্র অঙ্কন করে পার্বত্য ভূমি চিহ্নিত কর।
- ঘ. পূর্বদিকের দ্বীপমালা অঞ্চলকে কেন 'আগ্নেয়গিরি বলয়' বলা হয়? সপক্ষে যুক্তি দাও।



## একাদশ অধ্যায়

# দক্ষিণ এশিয়া

হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণে নেপাল, ভুটান, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এবং ভারত মহাসাগরে অবস্থিত শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্গত। এসব দেশের অধিকাংশই বিগত কয়েক দশকে স্বাধীনতা লাভ করেছে। পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৭ সালে। শ্রীলঙ্কা ১৯৪৮ সালে। মালদ্বীপ স্বাধীন হয়েছে ১৯৬৫ সালে। বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীন হয়। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ এবং বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয় ১৬ ডিসেম্বর। এজন্য ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবস।

**অবস্থান:** দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ এলাকা ৬° উত্তর অক্ষরেখা থেকে ৩৫° উত্তর অক্ষরেখা এবং ৬৫° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা থেকে ৯৫° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। এর উত্তরে হিমালয় পর্বতশ্রেণী, পূর্বে হিমালয়ের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা ও মায়ানমার; পশ্চিমে আফগানিস্তান, ইরান ও আরব সাগর এবং দক্ষিণে আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর অবস্থিত।

**আয়তন:** দক্ষিণ এশিয়ার মোট আয়তন প্রায় ৪৫ লক্ষ ৭৩ হাজার ৮৯২ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ রাষ্ট্র ভারতের আয়তন প্রায় ৩২ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫৯০ বর্গ কিলোমিটার। দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র পাকিস্তানের আয়তন প্রায় ৮ লক্ষ ০৩ হাজার ৯৪০ বর্গকিলোমিটার। ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র মালদ্বীপের আয়তন প্রায় ৩শ বর্গকিলোমিটার (উৎস: বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা শিট, ২০০০)। বাংলাদেশের আয়তন প্রায় ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার।

**অধিবাসী ও জনসংখ্যা:** সমগ্র এশিয়ার মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৩৬ ভাগ লোক দক্ষিণ এশিয়ায় বাস করে। ১৯৯৩ সালের হিসাব অনুসারে ভারতে প্রায় ৮৯ কোটি ৬৫ লক্ষ, পাকিস্তানে প্রায় ১২ কোটি ৮০ লক্ষ, বাংলাদেশে প্রায় ১১ কোটি ১৪ লক্ষ, শ্রীলঙ্কায় প্রায় ১ কোটি ৭৬ লক্ষ, মালদ্বীপে প্রায় ২ লক্ষ, নেপালে প্রায় ২ কোটি ১০ লক্ষ এবং ভুটানে প্রায় ১৬ লক্ষ লোক বাস করে। এ সকল দেশের বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার গড়ে ২ শতাংশের অধিক। বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা শিট, ২০০৮ অনুসারে ভারতে প্রায় ১১৪.৮০ কোটি, পাকিস্তানে প্রায় ১৬.৭৮ কোটি, বাংলাদেশে প্রায় ১৪.৬৭ কোটি, নেপালে প্রায় ২.৯৫ কোটি, শ্রীলঙ্কায় প্রায় ২.১১ কোটি, ভুটানে প্রায় ০.২৩ কোটি এবং মালদ্বীপে প্রায় ০.০৩ কোটি লোক বাস করে।

দক্ষিণ এশিয়ার এ দেশগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার অত্যন্ত বেশি এবং অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত ও দরিদ্র। এসব দেশে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী লোক বাস করে। এর মধ্যে বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং মালদ্বীপ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। নেপাল ও ভারতে হিন্দু এবং ভুটান ও শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

জাতিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পাকিস্তান ও ভারতের অনেক স্থানে ককেশীয় বা শ্বেতজাতীয় লোক বাস করে। দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীরা দ্রাবিড় নামে পরিচিত। দক্ষিণ ভারত, উত্তর শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশে ককেশীয়, মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ কৃষ্ণকায় মালয় জাতি বাস করে।

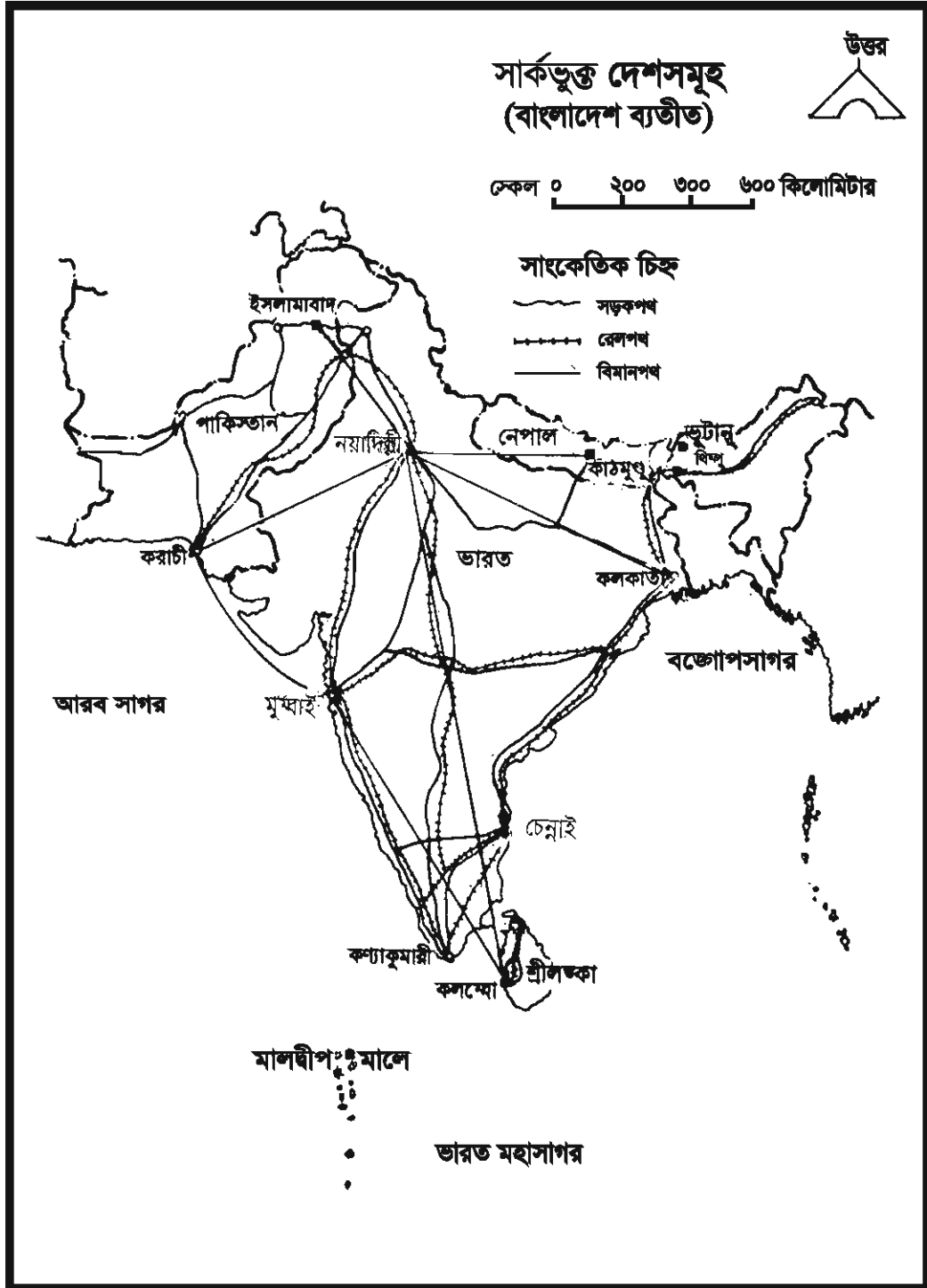
### সার্কভুক্ত দেশসমূহের ভৌগোলিক পরিচিতি (বাংলাদেশ ব্যতীত)

হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণে নেপাল, ভুটান, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এবং ভারত মহাসাগরে অবস্থিত শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত। ১৯৮৫ সালে দক্ষিণ এশিয়ার এ ৭টি দেশ আঞ্চলিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে একটি সংস্থা গঠন করে। এ সংস্থার নাম ‘দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা’। সংক্ষেপে এ সংস্থা ‘সার্ক’ (SAARC) নামে পরিচিত। (SAARC এর পুরো নাম হচ্ছে South Asian Association for Regional Co-operation)। প্রায় ১৪১ কোটি ১ লক্ষের অধিক লোক দক্ষিণ এশিয়ার এ দেশগুলোতে বাস করে (উৎস: বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা শিট, ২০০৩)। আফগানিস্তান সার্কের অষ্টম সদস্য হিসেবে যোগদান করেছে।

সার্কভুক্ত এ দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা অনুন্নত। এ অঞ্চলের অধিকাংশ দেশে শিক্ষিত জনসংখ্যার হার কম এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি।

### ভারত

দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম দেশ ভারত বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। ভারতের আয়তন প্রায় ৩২ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫৯০ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ১১৪ কোটি ৮০ লক্ষ।



চিত্র ১১.১ : দক্ষিণ এশিয়ার সার্কভুক্ত দেশসমূহ

**অবস্থান:** দেশটি  $৮^{\circ}$  উত্তর অক্ষরেখা থেকে  $৩৭^{\circ}$  উত্তর অক্ষরেখা এবং  $৬৮^{\circ}$  পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা থেকে  $৯৮^{\circ}$  পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত।

**সীমানা:** ভারতের উত্তরে বিশাল হিমালয় পর্বতমালা, চীন, নেপাল ও ভুটান; পূর্বে মায়ানমার ও বঙ্গোপসাগর; দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, শ্রীলঙ্কা এবং পশ্চিমে পাকিস্তান ও আরব সাগর অবস্থিত।

**ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু:** ভূপ্রকৃতি অনুসারে ভারতকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। যথা: (১) উত্তরের পার্বত্যভূমি, (২) গাঙ্গেয় সমভূমি এবং (৩) মধ্যভারত ও দক্ষিণাত্যের মালভূমি। সমগ্র ভারত মৌসুমি জলবায়ুর অন্তর্গত। সাধারণভাবে ভারতে গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ও আর্দ্র এবং শীতকাল মৃদু শীতল ও শুষ্ক থাকে।

**উদ্ভিজ্জ:** ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, জলবায়ু, বিশেষত বৃষ্টিপাতের তারতম্য এবং মৃত্তিকার পার্থক্যের জন্য ভারতে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিজ্জ জন্মে। এর মধ্যে সেগুন, শাল, পাইন, দেবদারু প্রভৃতি বৃক্ষ এবং উপকূল অঞ্চলে স্রোতজ বনভূমি উল্লেখযোগ্য।

**কৃষি:** ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। ধান, গম, ইক্ষু, তুলা, চা, পাট, তামাক, ডাল, তেলবীজ, মশলা ইত্যাদি এখানে জন্মে।

**খনিজ:** ভারত খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এখানে আকরিক লোহা, কয়লা, খনিজ তেল, অত্র, তামা, ম্যাংগানিজ ইত্যাদি পাওয়া যায়।

**শিল্প:** ভারত শিল্পে উন্নত। বস্ত্র, পাট, লোহা ও ইস্পাত, চিনি, সিমেন্ট, কাগজ প্রভৃতি শিল্পে ভারত প্রসিদ্ধ।

**যোগাযোগ ব্যবস্থা:** রেলপথ, সড়কপথ, জলপথ ও বিমানপথে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে।

**প্রসিদ্ধ স্থান:** ভারতের প্রসিদ্ধ স্থানগুলোর মধ্যে নয়াদিল্লি, কলকাতা, মুম্বাই, আগ্রা, আজমির, কানপুর, চেন্নাই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নয়াদিল্লি ভারতের রাজধানী। কলকাতা বৃহত্তম নগর ও পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী।

## নেপাল

তিব্বতের মালভূমি ও ভারতের মধ্যে হিমালয়ের পাদদেশে নেপাল অবস্থিত। নেপাল একটি স্বাধীন পর্বতময় দেশ। এর আয়তন প্রায় ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ১৮১ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৯৫ লক্ষ। অধিবাসীদের অধিকাংশ হিন্দু ধর্মাবলম্বী। এরা কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী।

নেপালের প্রাকৃতিক পরিবেশ অত্যন্ত মনোরম হলেও তা অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে বিশেষ অনুকূল নয়। নেপালে বিভিন্ন রকম জলবায়ু দেখতে পাওয়া যায়। সমভূমি অঞ্চলে উপক্রান্তীয়, কাঠমান্ডু উপত্যকায় নাতিশীতোষ্ণ ও পার্বত্য অঞ্চলে আলপাইন জলবায়ু দেখা যায়।

নেপালের অধিকাংশ এলাকা অনুর্বর ও পাথুরে মৃত্তিকা দিয়ে গঠিত। সমভূমি অঞ্চলের উর্বর মৃত্তিকায় গম, ধান, ভুট্টা, তেলবীজ, ডাল, কমলালেবু প্রভৃতি জন্মে। কৃষিকার্য ও পশুপালনই অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা।

বৃষ্টিবহুল নেপালের বনভূমিতে শাল, সেগুন, শিশু প্রভৃতি মূল্যবান কাঠ পাওয়া যায়। এখানে সামান্য পরিমাণে কয়লা, লোহা, তামা ও অত্র পাওয়া যায়। এ দেশে পাটজাত দ্রব্য, দিয়াশলাই, চিনি, জুতা, সিগারেট প্রভৃতি তৈরির কারখানা আছে। এখানকার প্রধান শিল্প হল পর্যটন শিল্প। হিমালয়ের সৌন্দর্য অবলোকনের জন্য এখানে নানা দেশের ভ্রমণকারীরা এসে থাকে।

**কাঠমান্ডু:** মধ্য উপত্যকায় অবস্থিত কাঠমান্ডু নেপালের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর। অন্যান্য শহরের মধ্যে পাতন, পোখরা, লুম্বিনি ও ভাটগাঁও উল্লেখযোগ্য।

## ভুটান

পূর্ব হিমালয়ের কোলে অবস্থিত ভুটান একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ভুটানের আয়তন প্রায় ৪৭ হাজার ১ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ২৩ লক্ষ। ভুটানের উত্তরাংশ বরফাবৃত ও পর্বতময়। মধ্যভাগের উপত্যকা অঞ্চলের উর্বর ভূমিতে

অধিকাংশ লোক বাস করে। কৃষিকার্য ও পশুপালন অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান, গম, যব, ভুট্টা, আলু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানে প্রচুর কমলালেবু জন্মে। বৃষ্টিবহুল পার্বত্য অঞ্চলের ঘন বনভূমিতে বহু মূল্যবান কাঠ পাওয়া যায়।

খনিজ সম্পদের মধ্যে ডলোমাইট, চুনাপাথর ও সৈন্ধব লবণ উল্লেখযোগ্য।

থিম্পু : থিম্পু ভুটানের রাজধানী ও প্রধান শহর।

### পাকিস্তান

ভারতের পশ্চিমে অবস্থিত পাকিস্তানের আয়তন প্রায় ৮ লক্ষ ০৩ হাজার ৯৪০ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি ৭৮ লক্ষ। অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৯৭ জন মুসলমান। এর উত্তরে আফগানিস্তান, দক্ষিণে আরব সাগর, পূর্বে ভারত এবং পশ্চিমে ইরান ও আফগানিস্তান অবস্থিত।

**ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু :** পাকিস্তান মৌসুমি জলবায়ুর অন্তর্গত। অধিকাংশ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড উষ্ণতা এবং শীতকালে তীব্র শীত অনুভূত হওয়ায় এখানকার জলবায়ু চরমভাবাপন্ন।

**কৃষিকার্য :** অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা কৃষিকার্য। এ দেশের জলবায়ু শুষ্ক হওয়া সত্ত্বেও পানিসেচের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে কৃষিকার্য করা হয়। গম, তামাক, তুলা, ধান প্রভৃতি পাকিস্তানের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য।

**খনিজ :** খনিজ দ্রব্যের মধ্যে খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও সৈন্ধব লবণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

**বনভূমি :** শুষ্ক জলবায়ুর জন্য এ দেশে বনভূমির পরিমাণ কম।

**শিল্প :** বস্ত্র, পশম, চিনি, সিমেন্ট, সার, লোহা ও ইস্পাত এবং জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য শিল্প।

**প্রধান শহর :** ইসলামাবাদ পাকিস্তানের রাজধানী। করাচী পাকিস্তানের সাবেক রাজধানী ও একমাত্র সমুদ্রবন্দর।

### শ্রীলঙ্কা

**অবস্থান :** ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত শ্রীলঙ্কা একটি ছোট দ্বীপ। পক প্রণালী এবং মান্নার উপসাগর দ্বারা এটি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন।

**ভূপ্রকৃতি :** শ্রীলঙ্কার মধ্যভাগ পর্বতসংকুল। এ পর্বতমালার চারদিক সমভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত।

**আয়তন ও জনসংখ্যা :** শ্রীলঙ্কার আয়তন প্রায় ৬৫ হাজার ৬১০ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ২ কোটি ১১ লক্ষ। অধিবাসীদের শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ শিক্ষিত। অধিবাসীদের শতকরা ৬৪ ভাগ বৌদ্ধ, শতকরা ২০ ভাগ হিন্দু এবং অবশিষ্ট মুসলমান ও খ্রিস্টান।

**জলবায়ু ও উদ্ভিজ্জ :** গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত শ্রীলঙ্কার জলবায়ু উষ্ণ হলেও সমুদ্রের প্রভাব ও আর্দ্রতার জন্য এখানকার জলবায়ু সমভাবাপন্ন। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতে বৃষ্টিপাত হয়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ২০৩ সেন্টিমিটার এবং বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২৪° সেলসিয়াস। এ দেশের এক-পঞ্চমাংশ ভূমি বনভূমিতে আবৃত। বনভূমির বৃক্ষের মধ্যে আবলুস, সেগুন, মেহগনি, সিঙ্কোনা প্রভৃতি প্রধান।

**কৃষিকার্য :** কৃষিকার্যই অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। পর্বত ঢালে চা, কফি, রবার, সমুদ্রোপকূলে নারকেল এবং নদী উপত্যকায় ধান, তামাক, সুপারি, লবঙ্গ, দারুচিনি ও এলাচির চাষ হয়।

**খনিজ ও শিল্প :** খনিজ দ্রব্যের মধ্যে গ্রাফাইট, চুনাপাথর, লোহা ও মূল্যবান পাথর উল্লেখযোগ্য। এ দেশ শিল্পে উন্নত নয়। তবে নারকেলজাত শিল্প গড়ে উঠেছে।

**প্রসিদ্ধ স্থান :** কলম্বো শ্রীলঙ্কার রাজধানী, প্রধান নগর ও বন্দর। কান্দি দেশের প্রাচীন রাজধানী।

## মালদ্বীপ

মালদ্বীপ প্রজাতন্ত্র এশিয়ার ক্ষুদ্রতম স্বাধীন রাষ্ট্র। প্রায় ১ হাজার ৩০০টি ক্ষুদ্র প্রবাল দ্বীপ নিয়ে দেশটি গঠিত। এ সব দ্বীপের মধ্যে কেবল ২০০টি দ্বীপে জনবসতি রয়েছে। এর আয়তন প্রায় ৩শ বর্গকিলোমিটার। ভারত থেকে প্রায় ৫শ ৯৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এটি অবস্থিত। মালদ্বীপকে ২০টি প্রশাসনিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। দেশটি ১৯৬৫ সালে স্বাধীনতা লাভ করে।

মালদ্বীপের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। দ্বীপটি ঘন নিরক্ষীয় বনভূমিতে আচ্ছন্ন। প্রায় সব দ্বীপেই নারকেল গাছ জন্মায়। মৎস্য শিকার অধিবাসীদের একটি প্রধান উপজীবিকা। এ ছাড়া যব, ফলমূল এবং সুপারি জন্মে। শুকনো মাছ রপ্তানি করা হয়। এর মোট জনসংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ। অধিবাসীদের প্রায় সবই মুসলমান।

**প্রসিদ্ধ স্থান :** মালে মালদ্বীপের রাজধানী। এখানকার একমাত্র বিমানবন্দরটির নাম গন।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- নিম্নের কোন দ্বীপগুলো ভারত মহাসাগরে অবস্থিত ?  
 ক. পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা  
 খ. ভারত ও মালদ্বীপ  
 গ. শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ  
 ঘ. পাকিস্তান ও ভারত
- ভারতে বেশি পরিমাণে জন্মে—  
 ক. শাল, সেগুন, মেহগনি  
 খ. শাল, সেগুন, দেবদারু  
 গ. শাল, সেগুন, আবলুস  
 ঘ. সেগুন, পাইন, মেহগনি

নিচের সারণি ব্যবহার করে ৩, ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

দেশসমূহ	আয়তন (বর্গকিলোমিটার)	জনসংখ্যা (কোটি)
শ্রীলঙ্কা	৬৫,৬১০	১.৯৩
ভুটান	৪৭,০০১	০.২৩
মালদ্বীপ	৩০০	০.০৩
নেপাল	১,৪৭,১৭৯	২.৫২

উৎস : বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা শিট, ২০০৮

- আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকে মালদ্বীপের অবস্থান কত ?  
 ক. প্রথম ও দ্বিতীয়  
 খ. দ্বিতীয় ও তৃতীয়  
 গ. দ্বিতীয় ও চতুর্থ  
 ঘ. প্রথম ও চতুর্থ

৪. নেপালের আয়তন মালদ্বীপ অপেক্ষা কতগুণ বেশি ?

ক. প্রায় ১ গুণ

খ. প্রায় ২ গুণ

গ. প্রায় ৩ গুণ

ঘ. প্রায় ৪ গুণ

৫. বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ—

i. শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপে

ii. শ্রীলঙ্কা ও ভুটানে

iii. ভুটান ও নেপালে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i, ii ও iii

৬. নিম্নের কোনটি দক্ষিণ এশিয়ার সীমারেখা?

ক. উত্তরে চীন ও আফগানিস্তান, পূর্বে মায়ানমার, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিমে আরব সাগর

খ. উত্তরে তাজিকিস্তান, পূর্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে মালয়েশিয়া এবং পশ্চিমে আফগানিস্তান

গ. উত্তরে চীন, পূর্বে মায়ানমার, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিমে আফগানিস্তান

ঘ. উত্তরে চীন ও আফগানিস্তান, পূর্বে মঙ্গোলিয়া, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিমে আরব সাগর

### সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ টেলিভিশনে একটি সম্মেলন সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছিল। আরাফ বাড়ির বড়দের সঙ্গে বসে টেলিভিশন দেখছিল। এক পর্যায়ে সে তার নানুকে জিজ্ঞেস করে, ‘নানু বারবার ৮টি দেশের পতাকা কেন দেখাচ্ছে?’ উত্তরে নানু বলেন, ‘দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি দেশের সমন্বয়ে একটি সম্মেলন হচ্ছে, তাই ৮টি দেশের পতাকা টাঙানো হয়েছে।’

ক. উপরের অনুচ্ছেদে নির্দেশিত সংস্থার নাম কী?

খ. শ্রীলঙ্কার শিল্পের বর্ণনা দাও।

গ. দক্ষিণ এশিয়ার একটি পূর্ণপৃষ্ঠা মানচিত্র অঙ্কন করে সম্মেলনের ৮টি দেশের অবস্থান চিহ্নিত কর।

ঘ. শ্রীলঙ্কা গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত হলেও এর জলবায়ু সমভাবাপন্ন কেন? যুক্তি দেখাও।

## দ্বাদশ অধ্যায়

# বাংলাদেশ

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন দেশ। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে দেশটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

**অবস্থান ও আয়তন:** বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম রাজ্য; পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম রাজ্য ও মায়ানমার দেশ; পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। ২০°৩৪' উত্তর অক্ষরেখা থেকে ২৬°৩৮' উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮৮°০১' পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা থেকে ৯২°৪১' পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে এ দেশটি অবস্থিত। বাংলাদেশের আয়তন প্রায় ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার।

**ভূপ্রকৃতি:** বাংলাদেশ একটি নদীবহুল দেশ। এ দেশের অধিকাংশ অঞ্চল নদীবাহিত পলিমাটি দিয়ে গঠিত নিম্ন সমভূমি। তবে এর উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে কিছু পাহাড়ি এলাকা রয়েছে। এ ছাড়া উঁচুভূমিও দেখা যায়। ভূপ্রকৃতির বিভিন্নতার জন্য বাংলাদেশকে নিম্নে বর্ণিত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

- ১। পাহাড়িয়া অঞ্চল,
- ২। পুরাতন পলল গঠিত উচ্চভূমি অঞ্চল,
- ৩। প্লাবন সমভূমি অঞ্চল।

**১। পাহাড়িয়া অঞ্চল:** বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ এ অঞ্চলের অন্তর্গত। এ পাহাড়গুলো বেলপাথর, শেল এবং কদম দিয়ে গঠিত। দক্ষিণ পূর্বের পাহাড়গুলো রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার অংশবিশেষে অবস্থিত। এগুলোর গড় উচ্চতা ৬১০ মিটার। বাংলাদেশের উঁচু পাহাড়ের চূড়া কিওক্লাডং-এ অঞ্চলের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। এর উচ্চতা ১২৩০ মিটার। সাম্প্রতিককালে বান্দরবানে আরেকটি উঁচু পাহাড়ের চূড়া আবিষ্কৃত হয়েছে। এর নাম তাজিনডং (বিজয়) এবং উচ্চতা ১২৩১ মিটার। এটিই বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের চূড়া। অসংখ্য চিরসবুজ ছোটবড় মূল্যবান বৃক্ষরাজি দ্বারা এসব পাহাড় আবৃত।

উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছোটবড় বিচ্ছিন্ন পাহাড়গুলোর অধিকাংশ ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলার উত্তরাংশ, সিলেট জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। এ ছাড়া সুনামগঞ্জের ছাতকে একটি টিলা রয়েছে। এসব পাহাড়ে ও টিলার ঢালে চা এর চাষ হয়।

**২। পুরাতন পলল গঠিত উচ্চভূমি অঞ্চল:** রাজশাহী বিভাগের বরেন্দ্রভূমি, ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলার মধুপুর গড় ও গাজীপুর জেলার ভাওয়ালের গড় এবং চট্টগ্রাম বিভাগের কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড় এ অঞ্চলের অন্তর্গত।

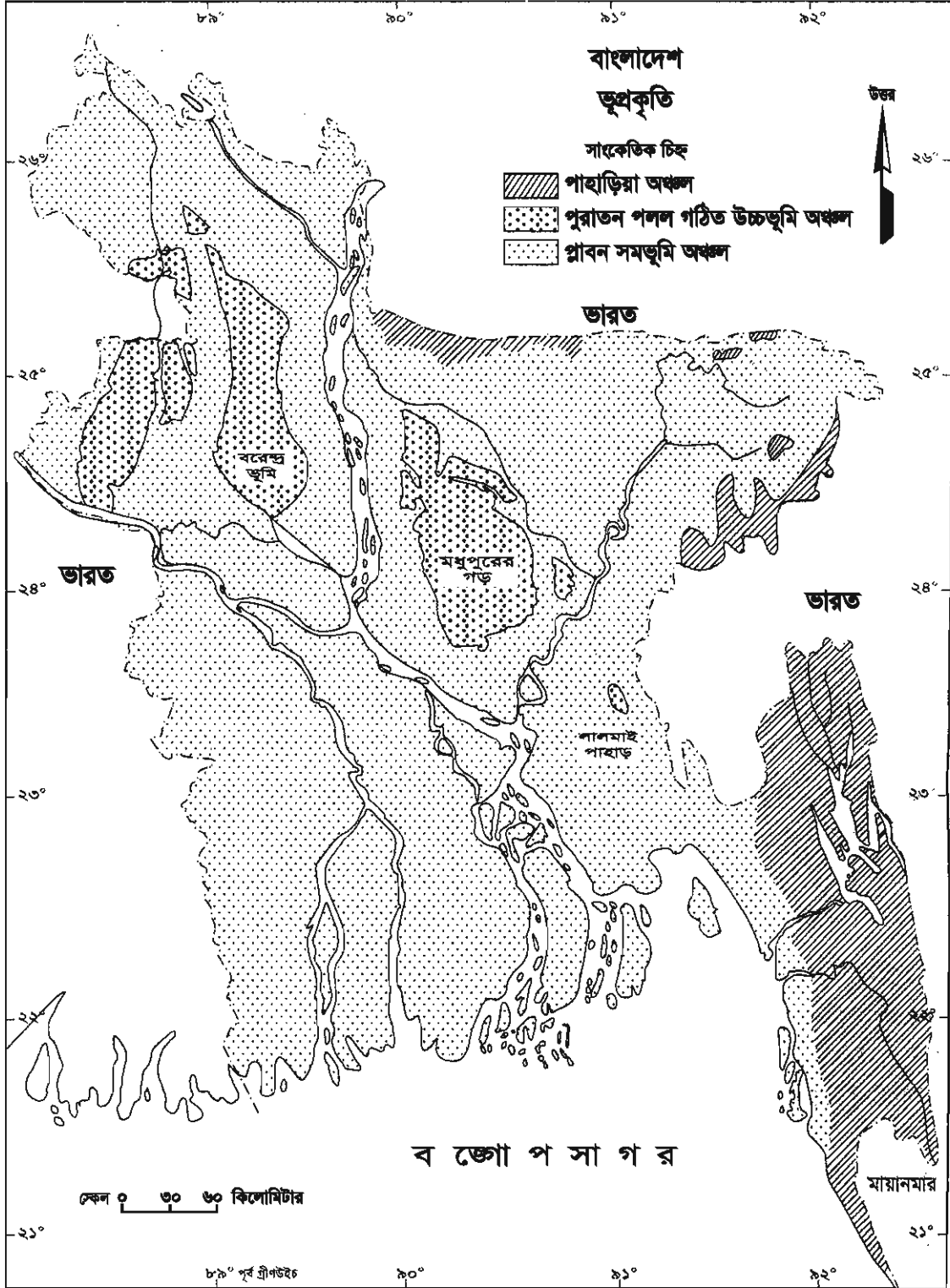
রাজশাহী বিভাগের বরেন্দ্রভূমির আয়তন প্রায় ৯ হাজার ৩২০ বর্গকিলোমিটার এবং প্লাবন সমভূমি হতে এর উচ্চতা ৬ থেকে ১২ মিটার। এ অঞ্চলের মাটির রং লালচে ও ধূসর।

মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়ের মোট আয়তন প্রায় ৪ হাজার ১০৫ বর্গকিলোমিটার। সমভূমি থেকে এ উচ্চভূমির উচ্চতা স্থানভেদে ৬ থেকে ৩০ মিটার এবং এর মাটির রং লাল।

লালমাই পাহাড়ের আয়তন প্রায় ৩৪ বর্গকিলোমিটার এবং গড় উচ্চতা প্রায় ২১ মিটার।

**৩। প্লাবন সমভূমি অঞ্চল:** পাহাড়িয়া অঞ্চল ও পুরাতন পলল গঠিত উচ্চভূমি ছাড়া বাংলাদেশের বাকি অংশ এ অঞ্চলের অন্তর্গত। এ অঞ্চলটি বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থান জুড়ে অবস্থিত এবং এর মোট আয়তন প্রায় ১ লক্ষ ২৪

হাজার ২৬৬ বর্গকিলোমিটার। ছোটবড় মিলিয়ে প্রায় ৭০০টি নদী এ দেশের বন্যার সৃষ্টি করে। এর ফলে দেশের অধিকাংশ অঞ্চল জলমগ্ন হয়। বছরের পর বছর এভাবে বন্যার সঙ্গে পরিবাহিত পলিমাটি জমা হয়ে এ প্লাবন সমভূমি গঠিত হয়েছে। তাই এ অঞ্চল কৃষিকার্যে উন্নত।



চিত্র ১২.১ : বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি



প্লাবন সমভূমির স্থানে স্থানে বহু নিম্নভূমি বা জলাশয় রয়েছে। এসব জলাশয়কে কোথাও হাওর, আবার কোথাও বিল বলা হয়। ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চলের জলাশয়গুলোকে হাওর বলে। রাজশাহী ও পাবনার মধ্যবর্তী জলাশয় ‘চলন বিল’ নামে পরিচিত। ঢাকা, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর অঞ্চলেও অনেক ছোট ছোট বিল রয়েছে।

এসব জলাশয়ে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। তবে শীতকালে পানি শুকিয়ে গেলে এসব জলাশয়ের কোনো কোনোটিতে ধানের চাষ হয়।

## নদী

পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা ও কর্ণফুলী বাংলাদেশের প্রধান নদী। এসব নদীর অনেকগুলো উপনদী ও শাখানদী রয়েছে। এসব নদী জালের ন্যায় দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। তাই বাংলাদেশকে নদীমাতৃক দেশ বলা হয়।

**পদ্মা:** গঙ্গা নদী হিমালয়ের গঙ্গোত্রী নামক হিমবাহ থেকে উৎপত্তি হয়ে গঙ্গা নামে ভারতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। পরে এ নদীটি রাজশাহী অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিম দিয়ে পদ্মা নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এরপর এটি দৌলতদিয়ার নিকট যমুনার সঙ্গে এবং চাঁদপুরের নিকট মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়ে মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

কুমার, মাথাভাঙা, ভৈরব, গড়াই, মধুমতী, আড়িয়াল খাঁ পদ্মার প্রধান শাখানদী। পদ্মার উপনদীগুলোর মধ্যে মহানন্দা প্রধান।

**ব্রহ্মপুত্র:** হিমালয়ের কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবর থেকে ব্রহ্মপুত্র নদী উৎপন্ন হয়েছে। তিব্বত ও আসাম পেরিয়ে নদীটি কুড়িগ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং দেওয়ানগঞ্জের নিকট দক্ষিণ-পূর্বে বাঁক নিয়ে ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভৈরববাজারের দক্ষিণে মেঘনায় পতিত হয়েছে। ধরলা ও তিস্তা ব্রহ্মপুত্রের প্রধান উপনদী। বংশী ও শীতলক্ষ্যা প্রধান শাখানদী।

**যমুনা:** ব্রহ্মপুত্রের যে শাখাটি যমুনা নামে দক্ষিণে প্রবাহিত হচ্ছে তা দৌলতদিয়ার নিকট পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। করতোয়া ও আত্রাই যমুনার প্রধান উপনদী। ধলেশ্বরী যমুনার শাখানদী এবং ধলেশ্বরীর শাখানদী বুড়িগঙ্গা।

**মেঘনা:** ভারতের বরাক নদী আসামের নাগা-মনিপুর জলবিভাজিকার দক্ষিণ ঢাল থেকে উৎপন্ন হয়েছে। পরে এ নদীটি সিলেট জেলা সীমান্তে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এরপর নদী দুইটি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গিয়ে কালনী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এ মিলিত প্রবাহ কালনী নামে দক্ষিণে কিছুদূর প্রবাহিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করে। মেঘনা ভৈরববাজারের কাছে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে এবং চাঁদপুরের কাছে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

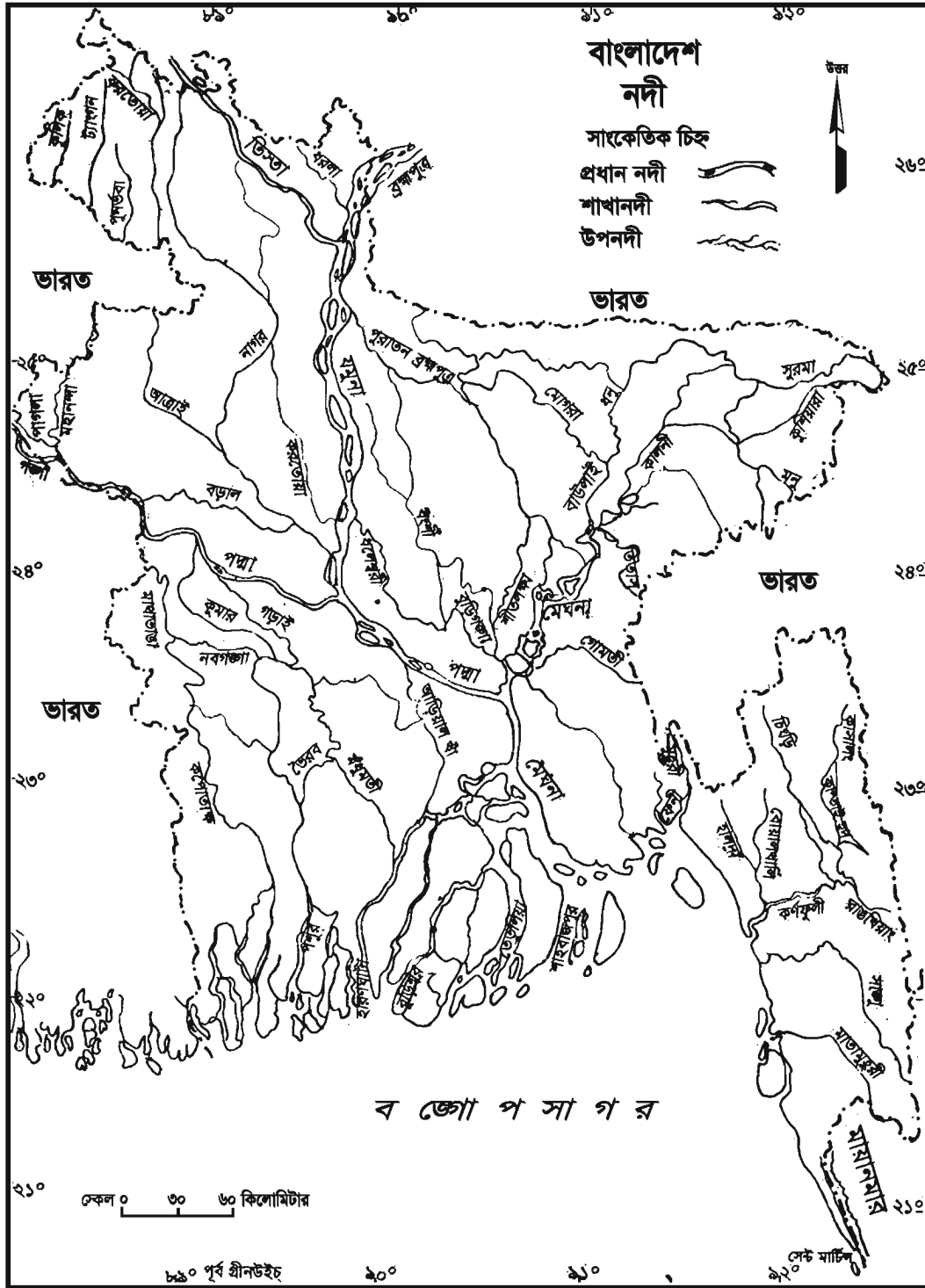
**কর্ণফুলী:** কর্ণফুলী নদী আসামের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে রাঙামাটি ও চট্টগ্রাম জেলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। কাশালং, হালদা ও বোয়ালখালি কর্ণফুলীর প্রধান উপনদী।

## জলবায়ু

বাংলাদেশ ক্রান্তীয় অঞ্চলের অন্তর্গত। এর প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা চলে গেছে। সাগর সান্নিধ্য এবং মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এখানে শীত ও গ্রীষ্মের তীব্রতা অধিক অনুভূত হয় না। মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ এ দেশের জলবায়ুতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এজন্য বাংলাদেশকে মৌসুমি অঞ্চলের দেশ বলা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা  $26.01^{\circ}$  সেলসিয়াস এবং গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ২০৩ সেন্টিমিটার। দেশের পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বৃষ্টিপাত বেশি এবং তাপ ক্রমশ কম। বার্ষিক বৃষ্টিপাত সিলেট অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি এবং রাজশাহী অঞ্চলে সবচেয়ে কম। তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাতের ওপর ভিত্তি করে এ দেশের জলবায়ুকে মূলত তিনটি ঋতুতে বিভক্ত করা হয়; যেমন: গ্রীষ্মকাল, বর্ষাকাল ও শীতকাল। বিভিন্ন ঋতুতে জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য নিম্নে বর্ণনা করা হল।

**গ্রীষ্মকাল:** মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে গ্রীষ্মকাল। এ সময় বায়ুর উষ্ণতা সাগর থেকে দেশের অভ্যন্তরের দিকে ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ ঋতুর চৈত্র-বৈশাখ মাসে যখন গরম বেশি হয়, তখন মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ও বজ্রসহ



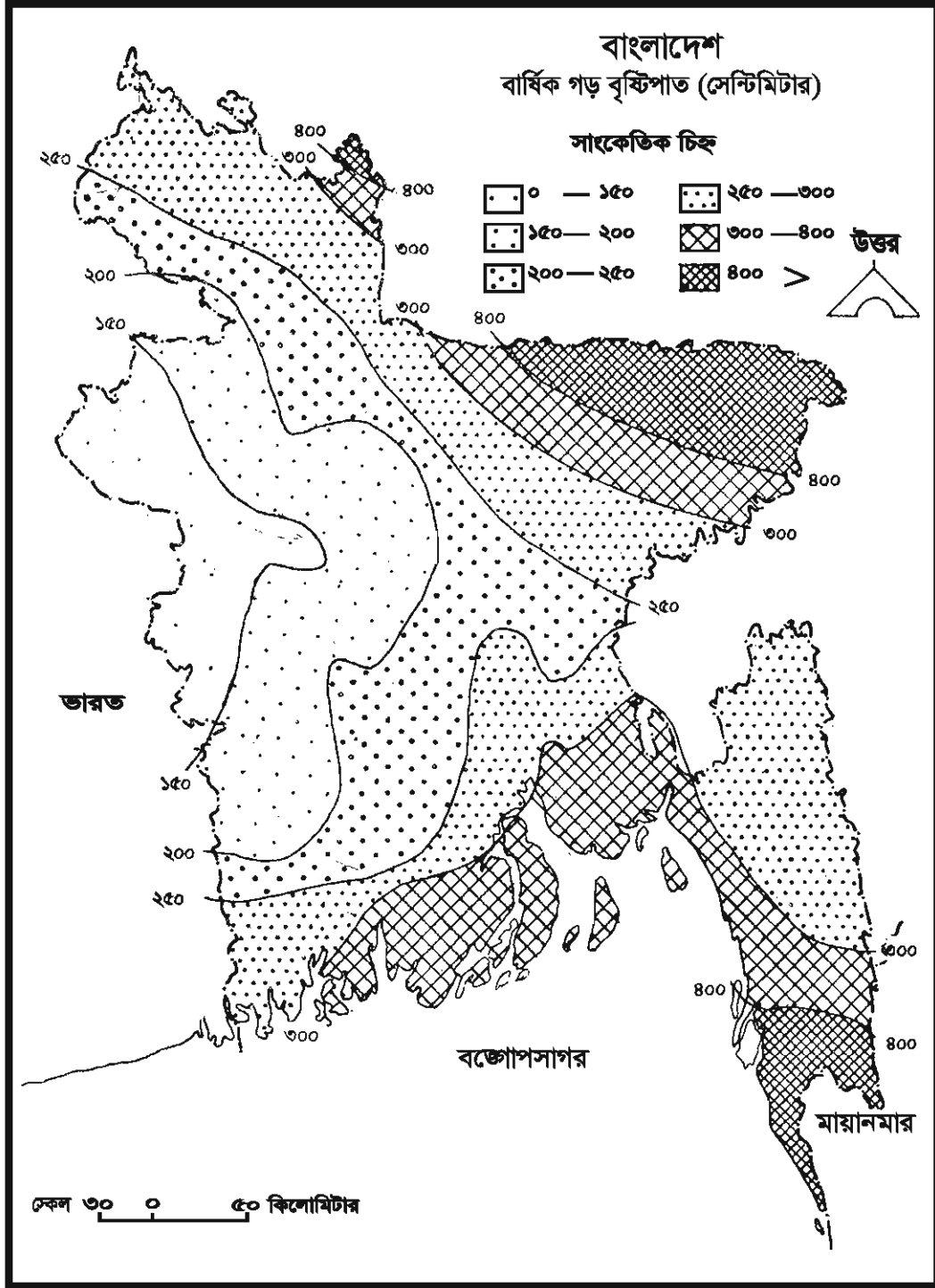
চিত্র ১২.২ : বাংলাদেশের নদী

প্রবল বাড় হয়। এ বাড়কে ‘কালবৈশাখী বাড়’ বলে। বাংলাদেশের মোট বৃষ্টিপাতের এক-পঞ্চমাংশ বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালেই হয়ে থাকে।

**বর্ষাকাল:** গ্রীষ্মের শেষে জুন মাসে বাংলাদেশে বর্ষাকাল শুরু হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে তখন প্রচুর বৃষ্টিপাত হতে থাকে। মার্চ-মার্চ, পুকুর, নদীনালা সব পানিতে থই থই করে। অক্টোবর মাস পর্যন্ত বর্ষাকাল স্থায়ী হয়। দেশের মোট বৃষ্টিপাতের পাঁচ ভাগের প্রায় চার ভাগ বৃষ্টিপাত এ ঋতুতেই হয়ে থাকে।

বর্ষার শেষে শরৎ ও হেমন্তকালে বায়ুর দিক পরিবর্তনের সময় দেশে আরেক বার ঝড়বৃষ্টি দেখা দেয়। এ ঝড়কে 'আশ্বিনে ঝড়' বলে।

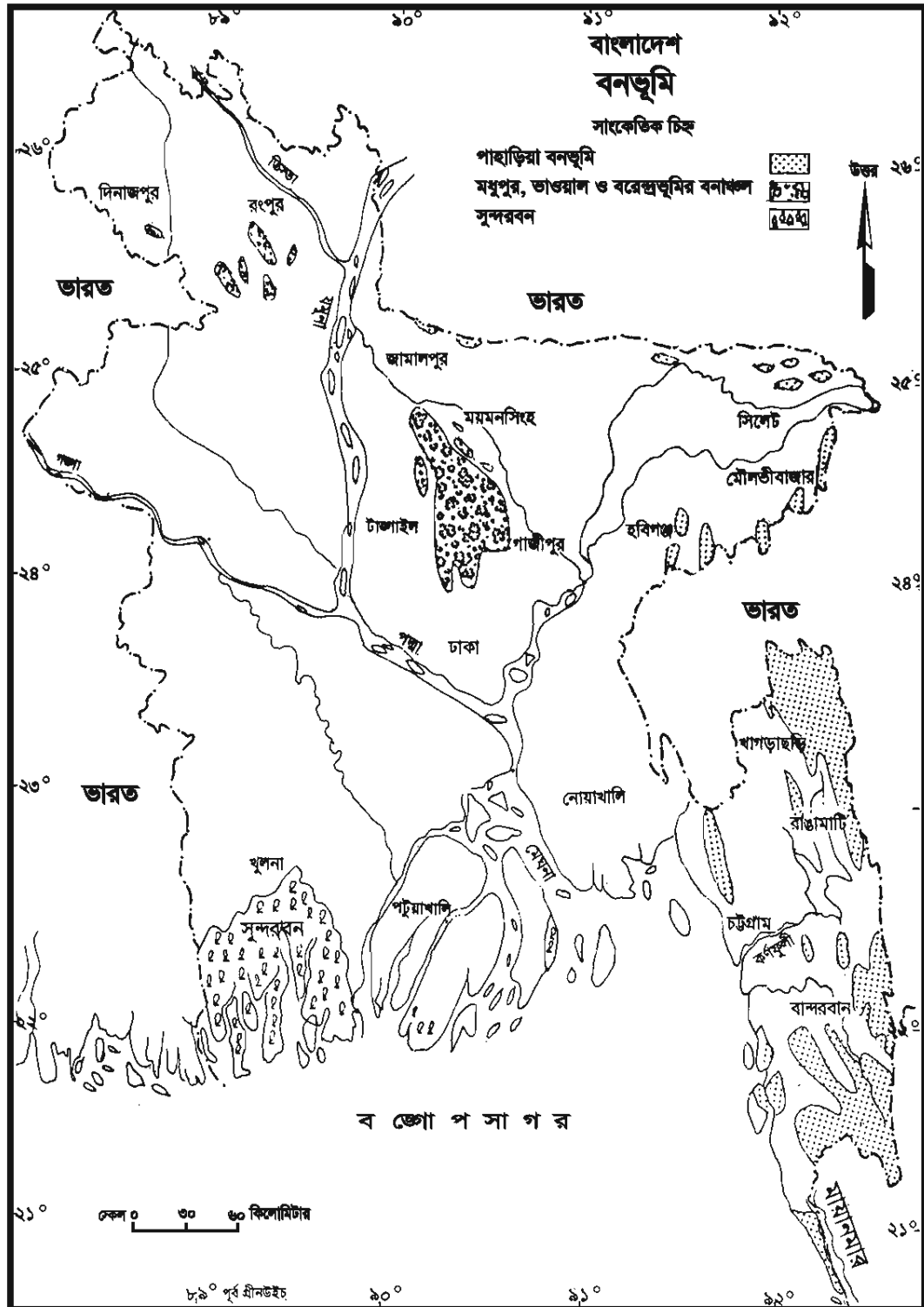
**শীতকাল:** বাংলাদেশে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত শীতকাল। এ সময় সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধে থাকায় তাপ যথেষ্ট কমে যায় এবং মৌসুমি বায়ু উত্তর পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়। স্থলভাগ থেকে আসে বলে এ বায়ুতে জলীয়বাষ্প খুবই কম থাকে। সেজন্য বাংলাদেশে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে।



চিত্র ১২.৩ : বাংলাদেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত

## বনজ সম্পদ

প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে বনজ সম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বনভূমি আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বাঁশ, কাঠ ও জ্বালানি এবং কোনো কোনো শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ করে থাকে। এ ছাড়া বনভূমি ঝড়-ভুসান, খরা প্রভৃতি থেকে দেশকে



চিত্র ১২.৪ : বাংলাদেশের বনভূমি

রক্ষা করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, একটি দেশের মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা দরকার। কিন্তু বাংলাদেশের মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ বনভূমি রয়েছে (উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩, পৃষ্ঠা ৬৩)। বাংলাদেশের বনভূমিকে তিনটি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যথা—(১) পাহাড়িয়া বনভূমি, (২) মধুপুর, ভাওয়াল ও বরেন্দ্রভূমির বনাঞ্চল এবং (৩) সুন্দরবন।

**১। পাহাড়িয়া বনভূমি:** বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, সিলেট, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার বনভূমি এ অঞ্চলের অন্তর্গত। এসব বনে গর্জন, সেগুন, চাপালিশ, তেলসুর, শিমুল, কড়ই, বাঁশ, বেত প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। এ বনাঞ্চলে হাতি ও বন্য শূয়ার আছে।

এ বনের কাঠ ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, নৌকা, রেলপথের স্লিপার ইত্যাদি নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া চন্দ্রঘোনা কাগজকল ও রেয়ন কমপ্লেক্সের কাঁচামাল এ বনাঞ্চল থেকেই সংগ্রহ করা হয়।

**২। মধুপুর, ভাওয়াল এবং বরেন্দ্রভূমির বনাঞ্চল:** ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর গড়, গাজীপুর জেলার ভাওয়ালের গড় এবং রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের বরেন্দ্রভূমি এ বনাঞ্চলের অন্তর্গত। এসব বনভূমির প্রধান বৃক্ষ শাল বা গজারি। এ ছাড়া ছাতিম, কড়ই, বহেড়া, কাঁঠাল, কুম্ভি, কুচি প্রভৃতি বৃক্ষও জন্মে।

শালকাঠ বৈদ্যুতিক তারের খুঁটি ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

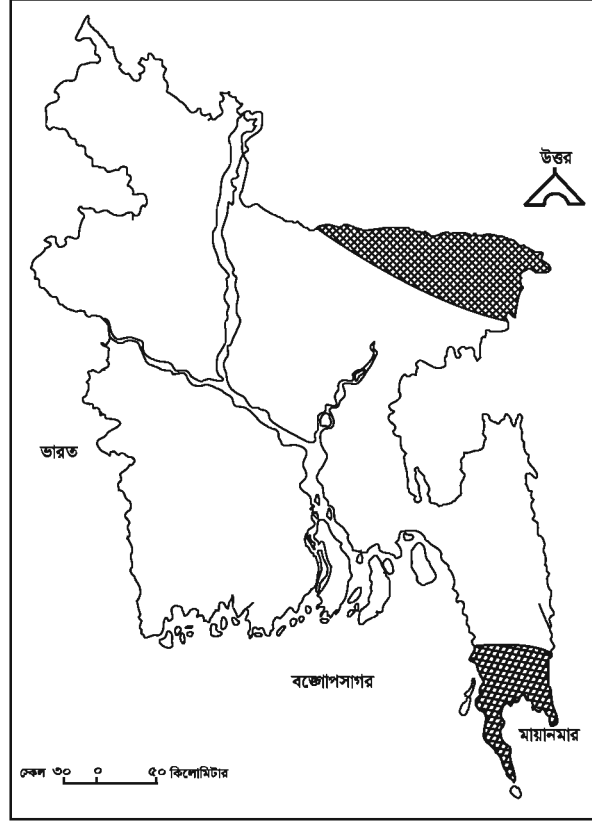
**৩। সুন্দরবন:** এ বনভূমির অধিকাংশ সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত। তবে সামান্য অংশ বরগুনা জেলায় পড়েছে। সুন্দরী ও গরান সুন্দরবনের প্রধান বৃক্ষ। এ ছাড়া কেওড়া, ধুন্দল, গেওয়া, গোলপাতাও এ বনাঞ্চলে জন্মে। বন্যপ্রাণীর মধ্যে বাঘ, সাপ, হরিণ ও বানর উল্লেখযোগ্য। এখানকার রয়েল বেঙ্গাল টাইগার পৃথিবী বিখ্যাত।

সুন্দরী বৃক্ষ জ্বালানি হিসেবে, গেওয়া নিউজপ্রিন্ট ও দিয়াশলাই কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে, ধুন্দল পেনসিল তৈরি করার জন্য এবং গরান বৃক্ষের বাকল চামড়া পাকা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া ঘরবাড়ি নির্মাণে গোলপাতার প্রয়োজন হয়। এ বন থেকে প্রচুর মধু ও মোমের উপকরণ আহরণ করা হয়।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ভারতের গঙ্গা নদী কোন নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে ?  
 ক. মেঘনা  
 খ. যমুনা  
 গ. কর্ণফুলী  
 ঘ. পদ্মা
২. নিম্নের কোন নদীগুলো একত্রে মিলিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে ?  
 ক. পদ্মা, যমুনা, কর্ণফুলী ও ধলেশ্বরী  
 খ. পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা  
 গ. পদ্মা, মেঘনা, মধুমতী ও সাজু  
 ঘ. পদ্মা, মেঘনা, তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র



মানচিত্রটি ব্যবহার করে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

৩. কর্কটক্রান্তি রেখা বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চল দিয়ে অতিক্রম করেছে?
 

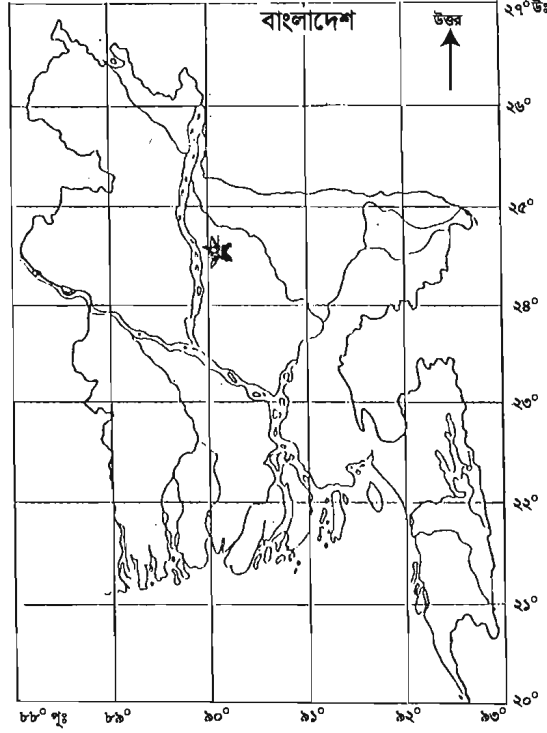
ক. কুমিল্লা ও দিনাজপুর	খ. কুমিল্লা ও বরিশাল
গ. কুমিল্লা ও সিলেট	ঘ. কুমিল্লা ও ফরিদপুর
৪. মানচিত্রে (■) চিহ্নিত অঞ্চল বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল। এ অঞ্চলগুলো হল-
 

ক. সিলেট, মৌলভীবাজার, কক্সবাজার	খ. সিলেট, রাঙামাটি, নেত্রকোনা
গ. হবিগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার	ঘ. সিলেট, কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন
৫. নিম্নের কোন উক্তিটি সঠিক?
 

ক. সুন্দরবনই একমাত্র ম্যানগ্রোভ বনভূমি।	খ. বরেন্দ্রভূমির বনাঞ্চলই ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল নামে পরিচিত।
গ. বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশে ম্যানগ্রোভ বনভূমি অবস্থিত।	

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১.



চিত্র : বাংলাদেশের নদী

- ক. উপরের মানচিত্রে তারকা চিহ্নিত প্রধান নদীটির নাম কী ?
- খ. বাংলাদেশের একটি প্রধান নদীর বর্ণনা দাও।
- গ. বাংলাদেশের একটি প্রতিলুপ মানচিত্র অঙ্কন করে পদ্মা ও মেঘনা নদীর গতিপথ দেখাও।
- ঘ. তুমি কি মনে কর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নদীর প্রভাব রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

২. শাওন, তৌফিক, মাসুদ শিক্ষা সফরে সুন্দরবন গিয়েছে। সুন্দরবনের বিশাল সম্পদের ভান্ডার দেখে তারা অভিভূত হয়। এসব সম্পদও যে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তা তারা এখানে আসার পর অনুভব করতে পারছে। তারা আরও অনুভব করে যে, এই বনভূমি কীভাবে সিডর নামের সেই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলগুলোকে রক্ষা করেছিল?

- ক. বাংলাদেশের মোট আয়তনের কত ভাগ বনভূমি রয়েছে?
- খ. বনভূমি থেকে আমরা যেসব সম্পদ সংগ্রহ করি তার একটি তালিকা তৈরি কর।
- গ. বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে সুন্দরবন চিহ্নিত কর।
- ঘ. এই সুন্দরবন ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলগুলোকে রক্ষা করেছে, এর সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

# পৃথিবী ও বাংলাদেশের জনসংখ্যা

### জনসংখ্যা : পৃথিবী ও বাংলাদেশ

আজ তোমাদের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। তোমাদের কি জানতে ইচ্ছে করে না যে বাংলাদেশে বর্তমানে কত লোক বাস করে? এ ছাড়া আশপাশের দেশ এবং গোটা পৃথিবীতে কত লোক বাস করে?

প্রথমেই আলোচনা করা যাক পৃথিবীর জনসংখ্যা নিয়ে। ১৯৯২ সালে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫৪৭ কোটি। ডান পাশের সারণি-১-এ আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট ২০০১ এবং বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা শিট ২০০৮ অনুযায়ী পৃথিবীর কয়েকটি দেশের আয়তন ও জনসংখ্যা দেখানো হল।

সারণি-১ থেকে তোমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আয়তন ও এর জনসংখ্যা কত তা জানতে পার। এ সারণিতে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি লোক বাস করে চীনদেশে। সেখানে জনসংখ্যা হল ১২৮ কোটিরও বেশি। দ্বিতীয় বড় দেশ হল ভারত, সে দেশে বাস করে ১০৬ কোটিরও বেশি লোক। তারপর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাম করা যেতে পারে। সেখানে বাস করে ২৯ কোটিরও বেশি লোক। আমাদের সার্কভুক্ত দেশ পাকিস্তানে রয়েছে ১৪ কোটিরও ওপরে লোক। ২০০৩ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসরত মোট জনসংখ্যা ছিল ৬৩১.৪০ কোটি।

এত লোকের বসবাস কিন্তু পৃথিবীতে এর আগে ছিল না। ২৫ বছর আগেও পৃথিবীতে প্রায় ৩৩০ কোটি লোক বসবাস করত। ৫০ বছর আগে এ পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ২২৫ কোটি এবং ১০০ বছর আগে এ পৃথিবীতে বাস করত মাত্র ১৫০ কোটি লোক। তা হলে গত ১০০ বছরে পৃথিবীর জনসংখ্যা ২.৬ গুণ বেড়েছে।

বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ১৯৪১ সালে প্রায় ৪.২০ কোটি লোক বাস করত। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১১ কোটি ১৫ লক্ষ হয়। সারণি-২-এ ১৯৪১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের আদমশুমারি অনুসারে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্রমধারা দেখানো হল।

গত ৬০ বছরে (১৯৪১-২০০১) বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ১৯৪১ সালে এ দেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ২০ লক্ষ। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত ২০ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ  $(৫.৫২-৪.২০) = ১.৩২$  কোটি। কিন্তু পরবর্তী ২০ বছরে অর্থাৎ ১৯৬১ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত

#### সারণি-১

দেশের নাম	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)	জনসংখ্যা (কোটিতে)
বাংলাদেশ	১,৪৭,৫৭০	১২.৯৩*
পাকিস্তান	৭,৯৬,১০১	১৪.৯১
ভারত	৩২,৮৭,৫৯১	১০৬.৮৬
নেপাল	১,৪৭,১৯৭	২.৫২
ভুটান	৪৭,০০১	০.০৯
শ্রীলঙ্কা	৬৫,৬১০	১.৯৩
মায়ানমার	৫,৭৬,৫৮০	৪.৯৫
চীন	৯৫,৭৩,৯৯১	১২৮.৮৭
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৯৫,২৯,০৯২	২৯.১৫
জাপান	৩,৭৭,৮০১	১২.৭৫
মালদ্বীপ	৩০০	০.০৩

\* আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট, আগস্ট, ২০০১  
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

#### সারণি-২

সাল	মোট জনসংখ্যা
১৯৪১	৪.২০ কোটি
১৯৫১	৪.১৯ কোটি
১৯৬১	৫.৫২ কোটি
১৯৭৪	৭.৬৪ কোটি
১৯৮১	৮.৯৯ কোটি
১৯৯১	১১.১৫ কোটি
২০০১	১২.৯৩ কোটি



মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ (৮.৯৯-৫.৫২) = ৩.৪৭ কোটি। তা হলে দেখা যায় যে প্রথম ২০ বছরের চেয়ে দ্বিতীয় ২০ বছরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ অনেক বেশি। অর্থাৎ সাম্প্রতিককালে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০০১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১২.৯৩ কোটি। পূর্বেই জানা গেছে যে, গত ১০০ বছরে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ২.৬ গুণ হয়েছে। সেই একই সময়ে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪ গুণেরও বেশি।

### জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

আগের আলোচনা থেকে জানা গেছে যে পৃথিবীর জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। কিন্তু কেন বাড়ছে এবং কীভাবে বাড়ছে তা কি তোমরা বলতে পারবে? বিষয়টা যদি একটু ভেবে দেখ তা হলে তোমরা সহজে বুঝতে পারবে। ধর, তোমাদের বাড়িতে আগে কেবল তোমার দাদা এবং দাদি থাকতেন। এরপর তাদের সন্তান হিসেবে তোমার বাবা, চাচা এবং ফুফুরা থাকতেন। তারও পরে তোমার ভাইবোন ও চাচাত ভাইবোনেরা একই বাড়িতে থাকতে শুরু করায় অনেক মানুষ হয়ে গেল। এর মধ্যে শুধু তোমার দাদা এবং দাদি মারা গেলেন। তখন তোমাদের বাড়ির দুই জন মানুষ কমে গেল। এরূপ অবস্থায় মানুষ বেড়েছে বেশি সে তুলনায় কমেছে কম। এ অবস্থা শুধু তোমাদের বাড়িতেই নয়, বরং সকলের বাড়িতে, সকল দেশে এবং সারা বিশ্বে। তা হলে দেখা যায় যে, কোনো দেশে শিশু জন্ম লাভ করে অধিক হারে অথচ কম হারে লোক মারা যায়। ফলে সে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কাজেই আমরা বলতে পারি এ ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হল অধিক জন্মহার ও কম মৃত্যুহার। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহারের পেছনে অনেকগুলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ আছে। এগুলোর মধ্যে প্রধান হল :

১। **শিক্ষায় অনগ্রসরতা** : বাংলাদেশে শিক্ষার প্রসারে বিশেষ অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। সাক্ষরতার হার ষাট শতাংশ অতিক্রম করেছে। এরপরও দেশের অনেক মানুষ নিরক্ষর রয়ে গেছে। শিক্ষার অভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ কম হয়। ফলে অধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অসুবিধা তারা অনুধাবন করতে পারে না। শিক্ষার দিক দিয়ে মেয়েরা আরও পেছনে। সমাজে রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২। **বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ** : আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত রয়েছে। উচ্চহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এটি একটি প্রধান কারণ। তা ছাড়া, প্রচলিত বহুদিনের প্রথা অনুযায়ী তুলনামূলকভাবে কম বয়সে এ দেশের ছেলেমেয়েদেরকে বিয়ে দেওয়া হয়।

৩। **দারিদ্র্য** : বাংলাদেশে উচ্চহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হল দারিদ্র্য। দরিদ্র পরিবারে সন্তান বেশি জন্ম নেয়। এসব সন্তান যথাযথভাবে লালন পালনের ব্যাপারে তারা উদাসীন। তাই দারিদ্র্য ও উচ্চ জন্মহার পাশাপাশি অবস্থান করে।

এ ছাড়াও জনসংখ্যা বৃদ্ধির আর একটি কারণ হল স্থানান্তর। স্থানান্তর হল বাসস্থান পরিবর্তন করা। পরিবারে লোকসংখ্যা যখন বৃদ্ধি পায় তখন পরিবারের কোনো কোনো সদস্য অন্যত্র গিয়ে বাড়ি বানিয়ে বসবাস শুরু করে। তবে এরূপ স্থান পরিবর্তন যদি দেশের ভেতরে হয় তবে সে দেশের মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধি কিংবা ঘাটতি হয় না। কিন্তু যদি তা এক দেশ থেকে অন্য দেশে হয় তবে যে দেশে স্থানান্তরিত হয়ে লোক আসে সে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ শুধুমাত্র জন্মহার অধিক হওয়া ও স্থানান্তরিত হয়ে লোক আসাই নয়, অন্য একটি কারণ হল মৃত্যুহার কমে যাওয়া। বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও গত কয়েক দশক ধরে মৃত্যুহার হ্রাস পাচ্ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান ও অন্যান্য প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

### নিজ পাড়া বা মহল্লার এক বছরের জনসংখ্যার খতিয়ান সংগ্রহ

একটি গ্রাম কতকগুলো পাড়া নিয়ে গঠিত। একটি গ্রামের সকল পাড়ায় লোকসংখ্যা গণনা করে আমরা ঐ গ্রামের মোট

জনসংখ্যা বলতে পারি। তেমনি প্রতিটি গ্রামের জনসংখ্যার সমষ্টি নিয়েই ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যা। এভাবে আমরা প্রতিটি উপজেলায়, জেলায় এবং সমগ্র দেশের জনসংখ্যা নির্ণয় করতে পারি। তোমরা তোমাদের নিজ পাড়া/মহল্লার ১ বছরের জনসংখ্যার খতিয়ান সংগ্রহ করে জনসংখ্যা জানতে পার।

নিম্নরূপ একটি ছক তৈরি করে তোমাদের পাড়ার দশটি বাড়ির তথ্য সংগ্রহ করে জনসংখ্যা ত্রাস বৃদ্ধির একটি খতিয়ান প্রস্তুত কর।

ছক	
১। (ক) পরিবারের প্রধানের নাম .....	
(খ) পাড়া বা মহল্লা .....	
২। ১ বছর পূর্বে পরিবারের সদস্যসংখ্যা .....	জন
৩। (ক) ১ বছরে জন্মগ্রহণকারী সদস্যসংখ্যা .....	জন
(খ) ১ বছরে বাইরে থেকে আসা সদস্যসংখ্যা .....	জন
	মোট ..... জন
৪। (ক) ১ বছরে মৃত্যুবরণকারী সদস্যসংখ্যা .....	জন
(খ) ১ বছরে পরিবার থেকে বাইরে চলে যাওয়া সদস্যসংখ্যা .....	জন
	মোট ..... জন

### বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতি

বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হারকে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার জনসংখ্যা নীতি গ্রহণ করেছেন। সরকার ইতোমধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সরকারের গৃহীত জনসংখ্যা নীতির মূল উদ্দেশ্য হল জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। এজন্য পরিবারের সদস্য সংখ্যা সীমিত রাখা প্রয়োজন। সরকারের জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নের ক্রোধান হল ‘ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট।’ জনসংখ্যা নীতি কার্যকর করার জন্য সরকার ১৯৯১ সালের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ২.১৭ থেকে কমিয়ে ১৯৯৫ সালে ১.৮১ হারে এবং ২০০২ সালে শতকরা ১.৩২ হারে আনার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়।

এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কৌশল হিসেবে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ প্রদান ও জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রম জোরদারকরণ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

### জনসংখ্যা সম্পর্কিত ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ

আমরা জানি পিতামাতা এবং ছেলেমেয়ে নিয়ে একটি পরিবার গঠিত হয়। পরিবারের এই তিন ধরনের সদস্য (ক) পিতা, (খ) মাতা ও (গ) সন্তান এর মধ্যে কারও গুরুত্ব কম নয়। পিতা ছাড়া যেমন পরিবার অচল, মাতা ছাড়াও তেমনি পরিবার অচল, আবার সন্তান। ছাড়াও পরিবার অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আবার পিতা যেমন এক পরিবারের পুত্রসন্তান তেমনি মাতাও অন্য এক পরিবারের কন্যাসন্তান। পিতা যদি যথার্থ যোগ্যতাসম্পন্ন না হন তা হলে যেমন পরিবার সুখী ও স্বচ্ছল হতে পারে না, তেমনি মাতাও যদি যথার্থ যোগ্যতাসম্পন্ন না হন তা হলে পরিবার সুখী ও সুন্দর হতে পারে না। অথচ আমাদের সমাজে মেয়েদের সম্পর্কে নানারকম কুসংস্কার চালু রয়েছে। অনেক পরিবারেই মেয়েরা অবহেলিত। অনেকে মনে করে পরিবারে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের জন্য টাকাপয়সা ব্যয় করা লাভজনক। কেননা ছেলেরা পিতামাতার শেষ বয়সের সম্বল। ছেলেরা উপার্জন করে সংসারে আয় বৃদ্ধি করে, অপরদিকে মেয়েরা সংসারের জন্য উপার্জনশীল নয়। বরং মেয়েরা উপার্জনক্ষম হতে না হতেই তাদের অন্যের সংসারে চলে যেতে হয়। তা ছাড়া পিতামাতার শেষ বয়সে মেয়েরা কাজে আসে না। সমাজে এ ধরনের কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণার ফলে মেয়েরা সমাজে অবহেলিত ও পরিবারে অনেক সময় ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এ কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েদের লেখাপড়ার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অল্প বয়সেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হয়। খাওয়া-পরা এমনকি চিকিৎসা ক্ষেত্রেও মেয়েদের প্রতি অবহেলা করা হয়। অথচ এ সকল বিষয় কেবল অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত ধারণার কারণেই হয়ে থাকে।

আল্লাহ মানুষের স্রষ্টা। ছেলে ও মেয়ে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষ সমান দায়িত্বশীল, সমান মর্যাদার অধিকারী। মেয়ে বড় হয়ে অন্য পরিবারে গেলে যদি যথার্থ শিক্ষিত ও যোগ্যতাসম্পন্ন হয় তবে সে পরিবারে দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করতে পারে। একটি শিক্ষিত জাতি গঠনের জন্য শিক্ষিত মা প্রয়োজন। বাবা সংসারের প্রয়োজন মেটাতে আয় রোজগারের তাগিদে ঘরের বাইরে বেশি অবস্থান করে। ছেলেমেয়েকে শিক্ষিত, চরিত্রবান, সৎ ও কর্মঠ এবং পরিচ্ছন্ন মনের অধিকারী করে গড়ে তুলতে মায়ের অবদানই বেশি। মা যে পরিবারে শিক্ষিত সেখানে ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত হবার সম্ভাবনা বেশি। নেপোলিয়ান ঠিকই বলেছেন-‘আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব।’ জনগণ যদি শিক্ষিত এবং যোগ্য হয়ে গড়ে উঠে তবে গোটা জাতি অর্থাৎ সবাই মিলে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবে। শিক্ষিত মায়েরা অনেক ধরনের উপার্জনশীল কাজে যুক্ত হতে পারেন। এভাবে তাঁরা যেমন পরিবারের আয় বৃদ্ধি করেন, তেমনি দেশের উন্নতিতেও ভূমিকা পালন করেন। তাই সমাজের জন্য, দেশের জন্য মেয়েদের শিক্ষিত করা, তাদের প্রতি যত্ন নেওয়া ছেলেদের তুলনায় কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তা ছাড়া পিতামাতার শেষ বয়সে তাদের পুত্রসন্তান যোগ্যতাসম্পন্ন না থাকলে কন্যাসন্তান অন্য পরিবারে যাওয়া সত্ত্বেও পিতামাতার প্রতি তার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। কেননা মেয়ে অন্যের সংসারে গিয়েও পর হয়ে যায় না, বরং অন্য একটি সংসারের সঙ্গে সে একটি আত্মীয়তা গড়ে তোলে এবং সবরকম দায়িত্ব পালন করতে পারে। সেজন্য মেয়েদেরও ছেলেদের মতো খাওয়া-পরা, শিক্ষা, চিকিৎসায় সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়া উচিত। কেননা সমান সুযোগ দিলে মেয়েরাও ছেলেদের মতো সমান জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এ ছাড়া কোনোক্রমেই মেয়েদের বাল্যবিবাহ কিংবা যথার্থ উপযুক্ত না হতেই বিয়ে দেওয়া উচিত নয়।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- নিম্নের কোন দেশে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি লোক বাস করে ?  
ক. বাংলাদেশ খ. ভারত  
গ. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ঘ. চীন
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার-এর ক্ষেত্রে কোন উক্তিটি সঠিক?  
i. অধিক জন্মহার ও কম মৃত্যুহার  
ii. বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ  
iii. জনসচেতনতা ও শিক্ষার হার বৃদ্ধি

### নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i খ. ii  
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের সারণি থেকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

সাল	জনসংখ্যা (কোটি)
১৯৪১	৪.২০
১৯৫১	৪.১৯
১৯৬১	৫.৫২
১৯৭৪	৭.৬৪
১৯৮১	৮.৯৯

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০০১

৩. উপরের সারণির আলোকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিম্নগতি কোন দশকে?  
 ক. ১৯৪১ খ. ১৯৫১  
 গ. ১৯৬১ ঘ. ১৯৮১
৪. ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যা কী পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে?  
 ক. ২.৪৭ কোটি খ. ৩.৪৭ কোটি  
 গ. ৪.৪৭ কোটি ঘ. ৫.৪৭ কোটি
৫. বাংলাদেশ সরকারের জনসংখ্যানীতির মূল উদ্দেশ্য হল—  
 ক. সমাজে ধর্মীয় কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণার অবসান করা  
 খ. বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ রোধ করা  
 গ. ছেলে সন্তান ও মেয়ে সন্তানের মধ্যে বৈষম্য দূর করা  
 ঘ. জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা

### সৃজনশীল প্রশ্ন

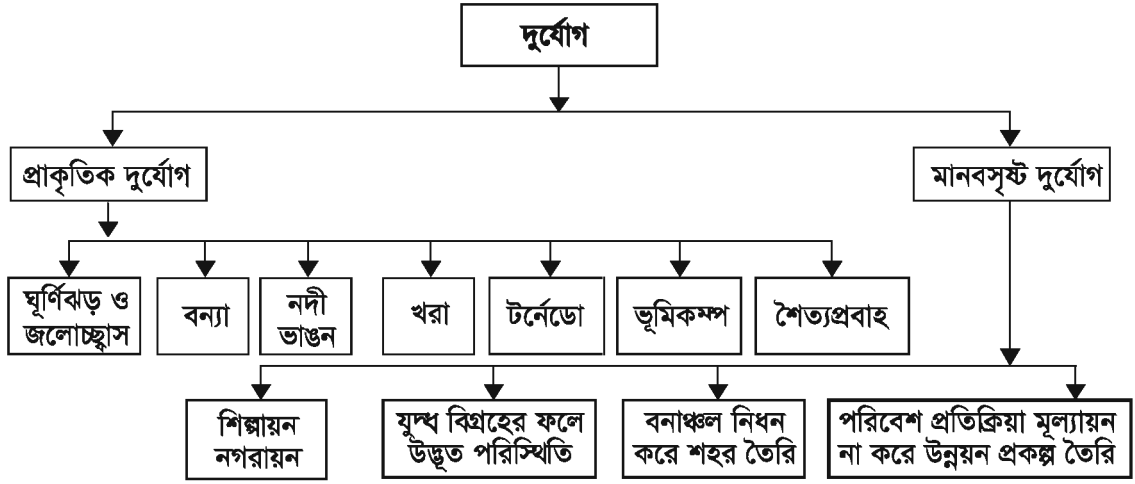
১. রাব্বি ঢাকায় বেড়াতে এসে মানুষের প্রচণ্ড ভিড় দেখে দাদুকে প্রশ্ন করে, ঢাকায় এত মানুষ কেন? দাদু রাব্বিকে বলেন, তিনি যখন ছোট ছিলেন তখন ঢাকায় এত মানুষ ছিল না। দাদু বলেন, ২০০১ সালের আদমশুমারির তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১২.৯৩ কোটি যা ১৯৪১ -এর তুলনায় প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আরও বলেন, এদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ করার জন্য মেয়েদের শিক্ষার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার।
- ক. ১৯৪১ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা কত ছিল?  
 খ. বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ বর্ণনা কর।  
 গ. গত পাঁচ বছরের আদমশুমারির তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার স্তম্ভ লেখচিত্রের সাহায্যে দেখাও।  
 ঘ. জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধে রাব্বির দাদুর বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দেখাও।
২. সাদিব টিভিতে প্রতিদিন ‘মিনা কার্টুন’ দেখে। ‘মিনা কার্টুন’ দেখে সাদিব অনুধাবন করতে পারে ছেলে এবং মেয়ে সমান। কিন্তু দাদি বলেন অন্য কথা। তিনি বলেন, সংসারে ছেলেরা বেশি কাজ করে থাকে তাই ছেলেদের প্রয়োজন বেশি। সাদিব তার পাঠ্যবইয়ে পড়েছে মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষ সমান দায়িত্বশীল ও সমান মর্যাদার অধিকারী।
- ক. ২০০২ সালে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়?  
 খ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানোর কৌশল হিসেবে একটি পদক্ষেপ বর্ণনা কর।  
 গ. সাদিবে দাদির বক্তব্য জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে কীভাবে প্রভাব ফেলে?  
 ঘ. নারী ও পুরুষের সমান মর্যাদা কীভাবে বিধান করা যায় তা ব্যাখ্যা কর।

## চতুর্দশ অধ্যায়

# বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ

**দুর্যোগ :** কোনো প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট অবস্থা যখন অস্বাভাবিক ও অসহনীয় পরিবেশের সৃষ্টি করে তখন তাকে দুর্যোগ বলে। দুর্যোগের ফলে দেশের শস্য ও সম্পদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। এতে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে, পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্যোগকবলিত এলাকার জনসাধারণ নানা দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হয়।

**শ্রেণীবিভাগ :** দুর্যোগকে সাধারণত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা-প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ। এই দুই শ্রেণীর অন্তর্গত দুর্যোগসমূহ নিচে উল্লেখ করা হল।



**প্রাকৃতিক দুর্যোগ :** প্রাকৃতিক কারণে যখন জনপদের স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় তখন তাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কখনও স্বল্প এলাকাজুড়ে, আবার কখনও বিস্তৃত এলাকার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। দীর্ঘমেয়াদি এবং বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে যখন দুর্যোগ হানা দেয় তখন সেই এলাকার সম্পদ, অর্থনীতি, জনগণের জীবনযাত্রা, বাড়িঘর অর্থাৎ পরিবেশকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে তোলে।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মূলত একটি দেশের ভৌগোলিক ও অবস্থানগত কারণের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, ভূমিরূপ, নদীনালা প্রাকৃতিক দুর্যোগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে। সেই জন্য এখানে প্রতি বছরই ছোট বা বড় ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস বা বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়।

**মানবসৃষ্ট দুর্যোগ :** মানুষ তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। অপরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন, নগরায়ন ইত্যাদি দুর্যোগের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিতে পারে। শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বেড়ে চলেছে। অগণিত কলকারখানা ও যানবাহন থেকে নির্গত হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, সিএফসি প্রভৃতি গ্যাসসমূহ। এর ফলে ঘটছে বিশ্ব-উষ্ণায়ন যা পৃথিবীর জন্য বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ বয়ে আনছে। বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে মানুষসহ সকল প্রাণী ও উদ্ভিদকে রক্ষা করে। চাষবাসের জন্য এবং নতুন শহর বা কারখানা স্থাপনের জন্য অনেক সময় বনাঞ্চল কেটে ফেলা হয়। এসব বৃক্ষ নিধনের ফলে পরিবেশের ওপর দীর্ঘমেয়াদি বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। যুদ্ধ মানব কর্তৃক সৃষ্ট ইচ্ছাকৃত দুর্যোগ। এর ফলে প্রচুর নিরীহ মানুষ মারা যায়, ঘরবাড়ি, রাস্তা ভেঙে যায়, সমগ্র দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয় এবং দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হয়। মানুষের সৃষ্ট অপর একটি দুর্যোগ যা বর্তমানে সবার বিশেষ চিন্তা এবং গভীর গবেষণার বিষয়, তা হচ্ছে ‘গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া’।

**বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ :** বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বঙ্গোপসাগরের চোঙাকৃতি জলরাশির শীর্ষদেশে বাংলাদেশের অবস্থান। এর তিনদিকে ভারত, দক্ষিণ-পূর্বে মায়ানমার এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। বিশ্বের সর্ববৃহৎ বদ্বীপ ও অন্যান্য ভৌগোলিক ও অবস্থানগত কারণে এ দেশে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, নদীভাঙন, খরা, টর্নেডো ও ভূমিকম্প উল্লেখযোগ্য।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস: পৃথিবীর যাবতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে তীব্রতার দিক থেকে উষ্ণমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ই সবচেয়ে ভয়াবহ। প্রতি বছর সাধারণত মে-জুন মাসে এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বঙ্গোপসাগরের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি স্থানে বেশকিছু নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই নিম্নচাপসমূহ প্রায়ই ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিয়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ঘনবসতিপূর্ণ জেলাসমূহে প্রচণ্ড আঘাত হানে। অন্যদিকে জলোচ্ছাস সৃষ্টি হয় ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের ঠিক নিচে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রবল বায়ুর বেগ উপকূলীয় অঞ্চলের উত্তাল জলরাশি সঞ্চিত করে উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানে। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠে কয়েক মিটার উচ্চতাসম্পন্ন জলস্তম্ভের সৃষ্টি হয়। প্রচণ্ড আঘাত হানতে সক্ষম ঢেউ সহযোগে এই বিপুল জলরাশি উপকূলের দিকে অগ্রসর হয় এবং জলোচ্ছাসের সৃষ্টি করে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রবল বাতাস যত না ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় জলোচ্ছাসের ফলে। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত পরিসংখ্যানের আলোকে বলা যায়, ১৯৬০ সাল থেকে এ যাবৎ মোট ৩৬ বার ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হেনেছে। কেড়ে নিয়েছে ১০ লক্ষাধিক প্রাণ, আর ধ্বংস করেছে কোটি কোটি টাকার সম্পদ। ঘূর্ণিঝড়গুলোর মধ্যে ১৯৭০, ১৯৮৫, ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়সমূহকে নজিরবিহীন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলা চলে। ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হওয়ার ঘটনাকে রোধ করা সম্ভবপর না হলেও এর ফলে সৃষ্ট বিপর্যয়কে অনেকাংশেই কমানো যায়। এর জন্য প্রয়োজন পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ, জরুরি কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর, দুর্যোগ-পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ। ঘূর্ণিঝড়প্রবণ উপকূলীয় অঞ্চলে মানুষের জানমাল রক্ষার্থে সরকার বিভিন্ন দেশের সহায়তায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করেছে।

বিগত ১৯শে মে, ১৯৯৮ চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন দ্বীপসহ উপকূলীয় অঞ্চলে যে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেছে তাতে বহুসংখ্যক প্রাণহানির ও বিষয়-সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা ছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের উপদ্রুত এলাকার সার্বিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাাদি গ্রহণের ফলে প্রাণহানি ও অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা অনেকখানি কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি সর্বস্তরের জনসাধারণ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিদেশী সাহায্য সংস্থাসমূহ এ কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

বন্যা: কোনো অঞ্চলে আকস্মিকভাবে নদীর পানিপ্রবাহ স্বাভাবিক সীমারেখা অতিক্রম করে দুই কূল প্লাবিত করলে বন্যার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ প্রায় প্রতি বছরই বন্যাকবলিত হয়। সমগ্র দেশটিই মূলত পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও যমুনার বয়ে আনা পলি দ্বারা গঠিত গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চল। এ কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর অধিকাংশ অঞ্চলের উচ্চতা মাত্র ২ থেকে ৪ মিটার। প্রায় সব বন্যাই পলল বয়ে আনার পাশাপাশি শস্য ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে দেশের সার্বিক অর্থনীতিকে ভয়াবহ অবস্থার দিকে ঠেলে দেয়। এ বন্যার পেছনে একাধিক প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত কারণ বিদ্যমান।

বাংলাদেশের উত্তরে বিশাল হিমালয় পর্বতমালার অবস্থান। এ দেশের প্রধান তিনটি নদীসহ প্রায় ৫৪টি নদীর উৎসই ভারতে। এ তিনটি নদী প্রতি বছর বর্ষাকালে হিমালয়ের বরফগলা কোটি কোটি কিউসেক পানি বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে বয়ে নিয়ে বঙ্গোপসাগরে ফেলে। এ সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু সাগর থেকে প্রচুর জলীয়বাষ্প বয়ে নিয়ে আসে। এতে শুরু হয় প্রবল বৃষ্টিপাত। ফলে বৃষ্টির পানি ও পাহাড়ের বরফগলা পানি একসঙ্গে মিশে নদীগুলোর ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত পানিপ্রবাহের সৃষ্টি করে। এই পানি নদীর দুই কূল ছাপিয়ে পড়ে, যার অনিবার্য ফল হিসেবে বন্যার সৃষ্টি হয়।

বন্যা সৃষ্টির আরেকটি কারণ হল-নদীগুলো বর্ষা মৌসুমে লক্ষ লক্ষ টন পলি বয়ে আনে। এর সবটুকুই সাগরে ফেলতে পারে না। তা নদীর তলদেশকে ভরাট করে ফেলে। ফলে নদীর পানি ধারণক্ষমতা হ্রাস পায়। এতে বিপুল পরিমাণ পানি সংকীর্ণ মোহনা দিয়ে সাগরে চলে যেতে পারে না।

এ দুইটি কারণে নদীর পানিপ্রবাহ তখন দুই কূল ভাসিয়ে দেয়। যে প্লাবন জমির উর্বরতা বাড়িয়ে দিয়ে শস্য ফলায়, সে প্লাবনই আবার তার সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে মহাপ্লাবনের সৃষ্টি করে।

১৯৮৮ সালে বাংলাদেশে এক প্রলয়ঙ্করী বন্যা সংঘটিত হয়। এতে দেশের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ এলাকা ডুবে যায় এবং জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তবে ১৯৯৮ সালে সংঘটিত বন্যা ছিল নজিরবিহীন। শতাব্দীর এ ভয়াবহতম মহাপ্লাবন প্রায় তিন মাসব্যাপী স্থায়ী হয়। বড় বড় নদীনালাগুলোর পানির উচ্চতা সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়। এ বন্যায় অনেক প্রাণহানি ছাড়াও বাড়িঘর, সড়ক, সেতু, শস্য, চাষাবাদ ও অন্যান্য অবকাঠামোর বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়। গোটা দেশের জনজীবন মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

**নদীভাঙন:** নদীভাঙন বাংলাদেশের অন্যতম দুর্যোগ। প্রতি বছর বিশেষ করে বন্যা মৌসুমে দেশের উল্লেখযোগ্য নদীতে পাড়ের ভাঙন মারাত্মক আকার ধারণ করে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের এক জরিপ অনুযায়ী দেশের ১৬টি নদীতে ২৫৪টি স্থানে উল্লেখযোগ্য নদীভাঙন লক্ষ করা গেছে। এই নদীভাঙন একাধারে এ সকল স্থানের কৃষি জমি, জনবসতি, বাজার, এমনকি বেশকিছু প্রতিষ্ঠিত শহরের অস্তিত্ব হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। বাংলাদেশের প্রায় সব নদীই সর্পিলা অথবা বিনুনি-সদৃশ। এরূপ বৈশিষ্ট্য নদীভাঙনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। যদিও নদীভাঙন এলাকা দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই দেখা যায়, তবে নদীর তীর ভাঙনের ক্ষেত্রে ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, পদ্মা এবং মেঘনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফলে এতদঞ্চলের বিপুলসংখ্যক জনগণ ভূমিহীন ও ভিটামাটিহীন হয়ে পড়ছে।

অনুমান করা যায় যে, দেশে প্রতি বছর ১০ লক্ষেরও বেশি জনসংখ্যা নদীভাঙনের ফলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নদীভাঙনের ফলে সহায় সম্বলহীন বাস্তুহারা এ জনগোষ্ঠী আশ্রয় ও জীবিকার সম্মানে শহরমুখী হচ্ছে। তারা শহরগুলোতে চরম দারিদ্র্য ও মানবতাবিরোধী জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে। নদীভাঙন রোধের জন্য প্রতি বছর প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হলেও এসব ব্যবস্থা পুরোপুরি কার্যকর নয়।

**খরা:** আবহাওয়াজনিত পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল অনাবৃষ্টি ও খরাকবলিত। প্রচণ্ড দাবদাহে দেশের উত্তর অঞ্চলগুলো ক্রমশ অনুর্বর হয়ে উঠছে। গ্রীষ্মকালীন অস্বাভাবিক কম বৃষ্টিপাত, মাটি থেকে পানির অতিরিক্ত বাষ্পীভবনের জন্য খরা হয়। খরার ফলে শস্যহানি হয়, জমিতে সেচকাজ ব্যাহত হয় এবং কৃষি উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

**টর্নেডো:** টর্নেডো ঘূর্ণিঝড় অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছোট আকারের বজ্রঝড়। এ ঝড় সাধারণত এপ্রিল-মে মাসে সংঘটিত হয় এবং খুব স্বল্প স্থানের মধ্যে স্বল্প সময়ে সীমাবদ্ধ থাকে। টর্নেডো সাধারণত কোনো স্থানের স্থল-নিম্নচাপের ফলে হয়ে থাকে। টর্নেডো দেখতে অনেকটা ফানেলের মতো। এর আকার হাতির শঁড়ের মতো। এর মাঝখানে থাকে একটি কেন্দ্র যার পাশ দিয়ে বাতাস প্রচণ্ডবেগে ঘুরতে থাকে।

বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে মাঝে মাঝে টর্নেডো হয়। ষাটের দশকে ঢাকার ডেমরায়, ১৯৮৯ সালের এপ্রিলে মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়ায় এবং ১৯৯১ সালের ১২ মে গাজীপুরে টর্নেডো তার বিধ্বংসী ছোবল হানে। টর্নেডোর প্রচণ্ড বায়ুর বেগ যা পায় উঠিয়ে নিয়ে দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে ফেলে এবং প্রাণহানি ঘটায়।

**ভূমিকম্প:** পৃথিবীপৃষ্ঠের আকস্মিক আন্দোলন এবং ভূঅভ্যন্তরীণ নানা কারণে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূকম্পন তরঙ্গ সিসমোগ্রাফ যন্ত্রের মাধ্যমে রেকর্ড করা হয়। মানুষের জীবন ও সম্পদ বিনষ্টকারী দুর্যোগের মধ্যে ভূমিকম্প অন্যতম। বাংলাদেশে বড় আকারের ভূমিকম্প পূর্বে অনুভূত হয়েছে এবং প্রায়ই ছোট ছোট ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ১৭৮৭ সালে যে ভূমিকম্প হয় তাতে ব্রহ্মপুত্র নদীর স্রোতপ্রবাহের পরিবর্তন ঘটে। পূর্বে এ নদীটি বৃহত্তর ময়মনসিংহের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়। বর্তমানে এ নদীটি গতিপথ পরিবর্তন করে যমুনা নাম ধারণ করে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

এরূপ প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প আবার যে হবে না এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। ভূকম্পন বিশারদদের মতে, নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশে একটি বড় ধরনের ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলীয় এলাকায় রিখটার স্কেল অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হতে পারে।

**শৈত্যপ্রবাহ:** ওপরে আলোচিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও শৈত্যপ্রবাহ অনেক সময় আমাদের জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। এর ফলে শস্য উৎপাদন ব্যাহত হয়। শীতকালে তীব্র শীতল বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় প্রতি বছরই কিছু মানুষ মারা যায়।

**দুর্যোগ মোকাবিলায় পরিকল্পনা:** মানুষ প্রাচীনকাল থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে অতি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ব্যাপার বলে মনে করত। মানুষ পরিবেশের বিপর্যয় ঠেকাবার জন্য বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ও কৌশল উদ্ভাবন করলেও দুর্যোগের হাত থেকে পুরোপুরি নিষ্কৃতি পায়নি, শুধু মোকাবিলা করছে মাত্র। গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের জন্য ভবিষ্যৎ দুর্যোগ সৃষ্টি করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ কারণে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন ও খরার ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য মহাপরিকল্পনা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়াজনিত দুর্যোগ পরিস্থিতিতে এর সঙ্গে সমন্বিত করে ভবিষ্যৎ কৌশল গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বিশেষ করে সময়ের ক্ষেত্রে প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রাণহানি হ্রাসসহ সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানো এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠা।

এজন্য প্রথমত প্রয়োজন হবে খাদ্য, সুপেয় পানি, ঔষধ এবং বস্ত্রের। দুর্যোগকবলিত অঞ্চলগুলোতে যাতে করে মানুষ স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসতে পারে তার জন্য প্রয়োজন হবে কিছু তাৎক্ষণিক এবং কিছু দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন কর্মসূচি। কৃষকদের বীজ ধান, সার এবং অন্যান্য কৃষি উপকরণ যোগান দিতে হবে। কৃষি ঋণের বন্দোবস্ত করতে হবে। যেসব রাস্তাঘাট, বাড়িঘর এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভেঙে গেছে সেগুলো মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে। সর্বোপরি বলা যায় যে, যেহেতু আমাদের দেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল, তাই এ দেশের দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রয়োজন একটি বিস্তারিত সরকারি পরিকল্পনা।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে সংঘটিত আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে—
  - i. ব্রহ্মপুত্র নদ-এর গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে
  - ii. যমুনা নদীতে অসংখ্য চর সৃষ্টি হয়েছে
  - iii. নদীভাঙনে পদ্মা নদীর প্রশস্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে

### নিচের কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i        | খ. ii          |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের সারণি থেকে ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

দুর্যোগ	ফলাফল
ভূমিকম্প	নদীর গতিপথ পরিবর্তন
বন্যা	নদীভাঙন
নগরায়ন	?
যুদ্ধ-বিগ্রহ	সম্পদ বিনষ্ট

২. ভূমিকম্পের ফলে বাংলাদেশের কোন নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়?
 

ক. যমুনা	খ. ব্রহ্মপুত্র
গ. সুরমা	ঘ. তিস্তা
৩. উপরের সারণির প্রশ্নবোধক চিহ্নিত স্থানে কোন শব্দ বসবে?
 

ক. বৃক্ষ নিধন	খ. অবকাঠামো উন্নয়ন
গ. গ্লিনহাউজ প্রতিক্রিয়া	ঘ. স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন
৪. নিম্নের কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগটি সম্প্রতি মায়ানমারে সংঘটিত হয়েছে?
 

ক. ক্যাটরিনা	খ. নাগর্গিস
গ. সিডর	ঘ. রিটা



## সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় সাম্প্রতিককালে চীনে সংঘটিত ভূমিকম্পের ভয়াবহতার সেই চিত্র দেখে জেনিতা শিহরে ওঠে। ২০০৭ সালে বাংলাদেশে সিডরের তাড়বচিত্র সে টেলিভিশনে দেখেছে। এ দুর্যোগ উপকূলীয় কয়েকটি জেলার মানুষজনের শুধু ঘরবাড়ি ধ্বংস করেনি, এর সঙ্গে জলোচ্ছ্বাস জমির ফসল ও অন্যান্য সম্পদের ক্ষতিসাধন করে। জেনিতার ধারণা উপকূলীয় অঞ্চলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র থাকলে জীবন ও সম্পদের ক্ষতি অনেকাংশে কম হত।
  - ক. সিডর কোন শ্রেণীর দুর্যোগ?
  - খ. এ ধরনের দুর্যোগ কীভাবে সৃষ্টি হয়ে থাকে?
  - গ. এ দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
  - ঘ. সিডর-এর ন্যায় দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে জেনিতার বক্তব্যের যথার্থতা মূল্যায়ন কর।
২. যমুনা পাড়ের বাসিন্দা শরীফা নদীভাঙনের শিকার হয়ে ঘরবাড়ি, ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। শরীফার মতো আরও অনেক পরিবার রয়েছে যারা দুর্যোগের স্বীকার হয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসতে পারে না।
  - ক. নদীভাঙন কী ধরনের দুর্যোগ?
  - খ. বাংলাদেশের বন্যার সঙ্গে নদীভাঙনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।
  - গ. নদীভাঙন এবং বন্যার ফলে বাংলাদেশের অবকাঠামোগুলো কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে?
  - ঘ. শরীফাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরিয়ে আনতে কী ধরনের দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার তা ব্যাখ্যা কর।